ফুটবল-সংখ্যা

আষাঢ় ১৩৮৫

আনন্দমেলা

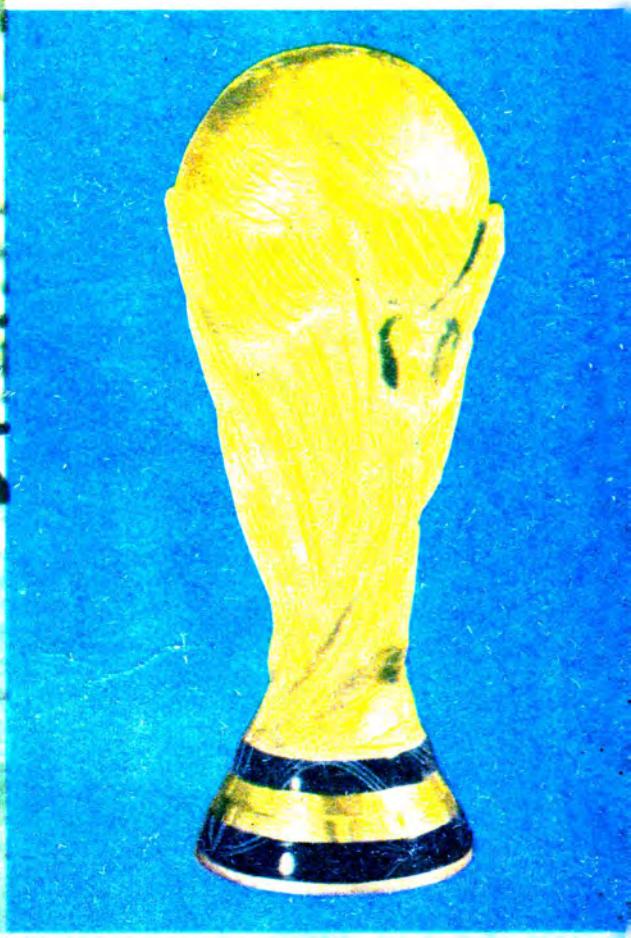

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

জেমসের মজার আসর

১০০১ টি পুরস্কার জিতে নাও!

যে সংখ্যাটি নেই সেটি কি?

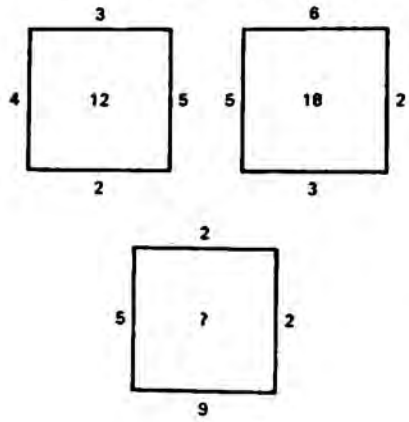

বড় স্পষ্ট হরফে শুধু ইংরেজিতে তোমাদের উত্তর আর নাম ও ঠিকানা লিখবে। এই ঠিকানায় পাঠাও ঃ

"Fun with Gems"
Dept. B-23,
Post Box No. 56,
Thane 400 601
Maharashtra

উত্তর পৌঁছবার শেষ তারিখ ঃ
৩০শে জুন, ১৯৭৮

শিগগীর!

তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের একটি খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্ট চেক পাবে।

রঙ-বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস্

CHAITRA-C161 -BEN

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার
কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র

আনন্দমেলা

আষাঢ় ১৩৮৫, জুন ১৯৭৮, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
দেড় টাকা

বিশেষ রচনা

গোলক পুরাণ। প্রেমেন্দ্র মিত্র ৫
বিশ্বকাপ-ফুটবলে এবারে কে কেমন লড়বে। মুকুল দত্ত ৬
ফুটবল-শব্দসন্ধান ১১
বিশ্বকাপ-ফুটবলে দুই জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, সুইডেন। শ্যামসুন্দর ঘোষ ১২
ব্রাজিল, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, চিলি, পেরু, মেক্সিকো। পুষ্পেন সরকার ১৫
ইতালি, পর্তুগাল, ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড। চিরঞ্জীব ১৯
সর্বকালের সেরা টীম। সুব্রত সরকার ২৫
বিশ্বকাপের খুচরো খবর। ফাইটার ২৮
হাঙ্গারি, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, রাশিয়া। অশোক দাশগুপ্ত ৩৭
এশিয়া, আফ্রিকা, ওশেনিয়া। বজ্রসেন ৪০
আমরা কেন যোগ দিই না। অমল দত্ত ৪৩
বিশ্বকাপ ফুটবল ঃ সচিত্র ধারাবিবরণী ৩৬

আত্মকথা

খেলতে-খেলতে। চুনী গোস্বামী ৪৫

উপন্যাস

বন্ধ ঘরের আওয়াজ। সমরেশ বসু ৪৮
অলৌকিক। বিমল কর ৫১

কমিক্‌স্

টারজান ২৬, টিনটিন ৩০, গোয়েন্দা বাজ ৩২, নোলেদা ৫৩

ছড়া

পাগলাটে। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৪৪ ; মজার পড়া। কুন্তক ৪৭ ; আঁকো। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪ ; মণিমেলার খবর ৫৪

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা বিপুল গুহ

প্রচ্ছদ-পরিচিতি ঃ (সামনের প্রচ্ছদে) ফিফার নতুন বিশ্বকাপ। (পিছন থেকে সামনের প্রচ্ছদে, উপরে) চুয়াত্তরের বিশ্বকাপ-ফাইনালে হল্যাণ্ডের ক্রুইফকে পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েছেন পশ্চিম জার্মানির একজন খেলোয়াড়। এর ফলে হল্যাণ্ড পেনাল্টি-শট পেয়ে এক গোলে এগিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেতে পশ্চিম জার্মানি, ২-১। (নীচে) সত্তরের বিশ্বকাপ-প্রতিযোগিতায় মেক্সিকোতে অস্ট্রেলিয়া ও ইজরায়েলের খেলা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধা, কিসের ফোটো, শব্দ-সন্ধান ও আটখানার সমাধান শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী, ধাঁধা-মজা-রহস্য ইত্যাদি রচনাও শ্রাবণ সংখ্যা থেকে আবার নিয়মিতভাবে পাওয়া যাবে।

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি· আই·টি· রোড কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

বেকেনবাউয়ারের হাতে বিশ্বকাপ (১৯৭৪)

ইতালির ডি সিস্টি (বাঁয়ে) ও উরুগুয়ের মানেরো

ঐতিহাসিক দৃশ্য। পেলে ও ববি মুর বিশ্বকাপের খেলার শেষে জার্সি বিনিময় করছেন (১৯৭০)

গোলক পুরাণ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিশ্বকর্মা পড়েছিলেন ফাঁপরে,
সত্য ত্রেতা পেরিয়ে এসে দ্বাপরে।
গড়েছিলেন মনের সাধে মনুষ্য,
কে জানত সেই কর্মই হবে অমন দুষ্য।
এক যে ছিল অনেক হয়েই সবাই করে বড়াই,
কে বড় তা করতে প্রমাণ থামে না আর লড়াই।
গণ্ডগোলে দিশাহারা, পান না কোনো কূল,
বিশ্বকর্মা ছেঁড়েন মাথার য'টা ছিল চুল।

এলেন তখন নারদ
সব মুশকিল-আসান-বিশারদ ঃ
বলেন এসে, "গণ্ডগোলটা বাধিয়েছেন তো জবর!
ছুটে এলাম তাই তো পেয়ে খবর।
গোল আপনার গোড়ার গলদ অবশ্য।
সূর্য চন্দ্র যা ধরেছেন
গোল করে সব গড়েছেন এই বিশ্ব।
বেহিসাবী গোল পাকাবার নেশায়
ভাবেননি ভবিষ্য।
যাই হোক নেই ভয়।
রোগের মাঝেই দাওয়াইটা তার
মিলবেই নিশ্চয়।
গোল-ই যখন গণ্ডগোলের মূল,
সেই গোলেতেই শোধরাবে সব ভুল।
বিষে বিষক্ষয় করতে
গোল দিয়ে সব বাঁচান।
গোলাকার এক চর্ম-গোলক
বিশ্ব তাতে নাচান।
নাচুক ঢ্যাঙা, নাচুক বেঁটে,
খেঁদা, খড়্গনাসা,
এই দুনিয়ার যেখানে যে কালা ধলা হলুদ
যার যাই হোক ভাষা।
গ-এ ওকার দিলেই দেখুন
পড়বে এসে ল,
তখন সবার একই চিন্তা
দিল কে, কে খেল।
হাত দুটি থাক ঠুঁটো হয়ে
খেলান পায়ে মাথায়
যত বড়াই লড়াই যেন
ওই গোলকই তাতায়।
আর যাই হোক, হস্ত দ্বারা
না হয় যদি স্পৃষ্ট
কতটুকু হবে বা অনিষ্ট!

মাঝে-মাঝে ফাটবে মাথা ;
চরণ হবে খঞ্জ,
গালাগালে মুখর হবে দেশ বা নগর গঞ্জ
তবু ভরসা এই,
যে বিষ শেষে প্রলয় ঘটায়,
কাটতে পারে বিশ্বজোড়া খেলা নিয়ে মেতেই।"

এই তো গোলক-পুরাণ!
ভক্তিভরে শুনলে হবে
বিশ্বকাপে সাতটা পেলে-র সমান।

ছবি বিমল দাশ

বিশ্বকাপ ফুটবল

এবারে কে কেমন লড়বে

মুকুল দত্ত

বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল পর্যায়ের খেলার কথা কী লিখব? ১৬টি দেশের মধ্যে কার ফুটবল-শক্তি কতখানি সে সম্বন্ধেই বা তোমাদের কী আন্দাজ দেব? আপাতত চোখ ছানাবড়া হয়ে যাচ্ছে খেলোয়াড়দের টাকার অঙ্ক হিসাব করতে করতে। খেলার খরচের অঙ্কটা তো অবাক করার মতো।

জানোই তো, পয়লা জুন থেকে আর্জেন্টিনার পাঁচটি শহরের পাঁচটি স্টেডিয়ামে ফাইনাল পর্যায়ের খেলা শুরু হচ্ছে। চলবে পঁচিশে জুন পর্যন্ত। খেলা হবে রাজধানী বুয়েনস এয়ারেসের রিভার প্লেটে এবং মেনডোজা, করডোবা, মার ডেল প্লাটা ও রোজারিও শহরে।

প্রায় এক মাসের এই প্রতিযোগিতার জন্য আর্জেন্টিনার খরচ কত হবে জানো? আর্জেন্টিনার সামরিক সরকারের কোষাগার-সম্পাদক জুয়ান আলেমান বলেছেন, সাতশো মিলিয়ন ডলার।

হবেই বা না কেন? বিশ্বকাপ-ফুটবল বা অলিম্পিকের আয়োজন এখন রাজসূয় যজ্ঞের মতো। এলাহি কাণ্ড। দেশের যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি করতে হয়। তৈরি করতে হয় নতুন নতুন স্টেডিয়াম, হোটেল, রেস্তোরাঁ। বিদেশী খেলোয়াড়, হাজার হাজার অতিথি ও হাজার দেড়েক সাংবাদিকের জন্য আরও কত রকমের ব্যবস্থা। বিশ্বকাপের খেলার জন্য আর্জেন্টিনায় নতুন টেলিফোনই বসানো হয়েছে চল্লিশ হাজার, নতুন টেলেক্স লাইন তিন হাজার।

প্রতিযোগিতার এই বিপুল খরচের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের রোজগারটাও দ্যাখো। শুধু ফাইনাল পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ইরানের এক একজন খেলোয়াড় কুড়ি লাখ করে টাকা পেয়েছে সে-কথা আগেই লিখেছি। আজ লিখছি শুধু একজন খেলোয়াড়ের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা। সেই একজন এখন পৃথিবীর সবচেয়ে নামী ও দামী ফুটবলার। নাম নিশ্চয়ই শুনেছ —যোহান ক্রুইফ। হল্যাণ্ডের খেলোয়াড়। ১৯৭৪-এর বিশ্বকাপের খেলার আগেই আজাক্স ক্লাব দেড় কোটি টাকায় কিনে-ছিল ক্রুইফকে। তবে শর্ত ছিল বিশ্বকাপে ক্রুইফ খেলবেন তাঁর নিজের দেশ হল্যাণ্ডের পক্ষে। খেলেছিলেনও। বিশ্বকাপ ফাইনালে হল্যাণ্ড ১—২ গোলে পশ্চিম জার্মানির কাছে হেরে যাবার পর ক্রুইফ আবার চলে যান স্পেনে। এখন খেলছেন স্পেনের বার্সিলোনা ক্লাবে। যখন এই লেখাটা তৈরি করছি, তখনকার খবর, বিশ্বকাপে ক্রুইফকে তাঁর দেশের হয়ে খেলাবার জন্য হল্যাণ্ড যেমন জোর চেষ্টা করছে, তেমন তাঁকে দলে টানবার জন্য কোমর বেঁধে আসরে নেমেছে আমেরিকার কসমস ক্লাব, পেলেকে নিয়ে যারা কলকাতায় খেলতে এসেছিল।

ক্রুইফের মতো এত অর্থ না পেলেও আর্জেন্টিনায় ১৬টি দলে এমন বহু খেলোয়াড় খেলছেন যাঁদের কাছে দশ-বিশ লাখ টাকা তুচ্ছ ব্যাপার। অনেকেরই বার্ষিক আয় কোটির কাছাকাছি। এঁরাই বিশ্বকাপের খেলার বড় আকর্ষণ।

আর্জেন্টিনায় কোন্ দেশ কেমন খেলবে এবং কোন্ দেশ বিশ্বকাপ জিতবে বলা শক্ত। ওদের খেলা সম্পর্কে আমরা তো একেবারেই অন্ধ। খেলা দেখিনি। চোখের সামনে যাদের খেলা দেখছি তাদের সঠিক শক্তিই কি সবসময় পরিমাপ করতে পারি?

বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায়ের দলগুলি সম্পর্কে আমাদের ধারণা বিদেশী পত্রপত্রিকা থেকে। ফুটবলের ব্যাপারে যাঁরা দারুণ বোদ্ধা, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত চষে বেড়ান ফুটবল সমীক্ষার জন্য, তাঁদের হিসাবেও কিন্তু হামেশা গরমিল ঘটে। ১৯৬৬ সালে বহু ফুটবল পণ্ডিত মন্তব্য করেছিলেন, "উত্তর কোরিয়া যদিও ইংলণ্ডে আসছে বিশ্বকাপের খেলার জন্য, আসলে এটা হবে ওদের প্রমোদ-ভ্রমণ এবং লণ্ডন-দর্শন।" সেই উত্তর কোরিয়া কিন্তু তারকাখচিত ইতালি দলকে ১—০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল। কোয়ার্টার ফাইনালে ইউসেবিওর শক্তিশালী পর্তুগাল দলের বিরুদ্ধে ২৫ মিনিটের মধ্যে ৩—০ গোলে এগিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হেরে গেল ৩—৫ গোলে। সেবার সবাই ধরে রেখেছিল, পেলের ব্রাজিল দলই চিরতরে জুলে রিমে কাপটি নিয়ে নেবে। সেই ব্রাজিল গ্রুপ লীগ থেকে বিদায় নিল হাঙ্গারি ও পর্তুগালের কাছে একই ফলে, ১—৩ গোলে

হাঙ্গারি কেমন টীম? বুদাপেস্টে ১৯৫৪ সালে ইংল্যাণ্ডকে ৭—১ গোলে হারিয়েছিল। সেই খেলায় হাঙ্গারির ষষ্ঠ গোলের ছবি।

হেরে। দলগত শক্তি ও খেলার ফলে গরমিলের এমন ভূরি-ভূরি নজির আছে। এবং দুই দলের দুটি খেলার ফল যে কত উল্টো-পাল্টা হতে পারে তার বড় নজির আছে বিশ্বকাপেই, সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ১৯৫৪-র প্রতিযোগিতায়। কারো মনে কোনই সন্দেহ ছিল না যে, পুসকাসের হাঙ্গারি দল জিতবে। কারণ হাঙ্গারি তখন ফুটবলে দারুণ শক্তিশালী। বাহান্ন মাসের মধ্যে একটি খেলাতেও হারেনি। কিন্তু যে পশ্চিম জার্মানি দ্বিতীয় পুলে ৩—৮ গোলে হেরে গিয়েছিল হাঙ্গারির কাছে সেই পশ্চিম জার্মানি ফাইনালে ৩—২ গোলে হাঙ্গারিকেই হারিয়ে ফুটবলে বিশ্বজয়ী হল। তাও সাত মিনিটের মধ্যে হাঙ্গারি ২—০ গোলে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। সুতরাং পণ্ডিতদের ভবিষ্যদ্বাণী বহু ক্ষেত্রেই মেলে না।

কার শক্তি কতখানি সে সম্পর্কে অবশ্যই কিছুটা আভাস দেবার চেষ্টা করব। ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছতে যে-দল যে-ফল করেছে সেই ফল এবং সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক খেলার ফল থেকেও শক্তির কিছুটা আন্দাজ মিলবে। কীভাবে গ্রুপ ভাগ হয়েছে, 'আনন্দ-মেলায়' আগে তা লিখেছি। আবার গ্রুপ ধরেই সমীক্ষার চেষ্টা করছি। সেইসঙ্গে দিচ্ছি বিভিন্ন দলের পূর্ব-কৃতিত্বের পরিচয় এবং খেলার তারিখ। জানো বোধহয়, প্রতি গ্রুপের প্রথম দুটি দল খেলবে দ্বিতীয় পর্যায়ে।

গ্রুপ—এক

আর্জেণ্টিনা, হাঙ্গারি, ফ্রান্স, ইতালি

খেলার তারিখ : ২ জুন—হাঙ্গারি ঃ আর্জেণ্টিনা ফ্রান্স ঃ ইতালি। ৬ জুন—আর্জেণ্টিনা ঃ ফ্রান্স ; ইতালি ঃ হাঙ্গারি। ১০ জুন—ইতালি ঃ আর্জেণ্টিনা ; ফ্রান্স ঃ হাঙ্গারি।

আর্জেণ্টিনা

আগেই লিখেছি, একাদশ বিশ্বকাপ-ফুটবল প্রতিযোগিতা আর্জেণ্টিনায় হচ্ছে বলে আর্জেণ্টিনাকে প্রাথমিক লীগে খেলতে হয়নি, সরাসরি সে ফাইনাল পর্যায়ে খেলার অধিকার পেয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটি এবার নিয়ে সাতবার ফাইনাল পর্যায়ে খেলছে। রানার্স হয়েছে ১৯৩০ সনে। অর্থাৎ প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায়।

আর্জেণ্টিনা দলে বেশ কিছু সমস্যা দানা বেঁধে উঠেছে। লেফট ব্যাক ও জাতীয় দলের অধিনায়ক জোরগে ক্যারাসকোমা নাকি খেলবেন না। এক নম্বর গোলকীপার হুগো গার্ডকে বাদ দেওয়া হয়েছে প্র্যাকটিসে না আসায়। তিনজন অসাধারণ খেলোয়াড়—ব্যাক এনরিক উলফ, সুইপার অসওয়াল্ড পিয়াজা এবং স্ট্রাইকার মেরিও কেম্পেস রয়েছেন স্পেনের তিনটি ক্লাবে। এই লেখার সময় পর্যন্ত আর্জেণ্টিনা এই তিনজনকে পায়নি। এখনো পাবার চেষ্টা চলছে। মিডফীল্ডার রিকার্ডো ভিলাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড দাম পেয়ে টেকসাসে চলে যাবার মতলব করায়। তাঁকেও আবার দলে নেবার চেষ্টা করা হচ্ছিল। এঁরা যদি আর্জেণ্টিনা দলে খেলেন, তবে দলটি খুবই শক্তিশালী হবে। অবশ্য আর্জেণ্টিনায় ট্যালেণ্টেড ও স্কিলফুল খেলোয়াড়ের অভাব নেই। ম্যানেজার সিজার মেনোত্তি তারুণ্যকে প্রাধান্য দিয়ে দল গড়ার চেষ্টা করছেন।

ইতালি

ইতালি বিশ্বফুটবলে বিজয়ী হয়েছে দুবার, ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে। ব্রাজিলের মত ইতালির সামনেও চিরতরে সোনার পরীটি লাভের সুযোগ এসেছিল মেকসিকোয় ১৯৭০-এর প্রতিযোগিতায়। কিন্তু ফাইনালে ব্রাজিলের কাছেই ১—৪ গোলে হেরে গিয়ে রানার্স হয়। এবার নিয়ে ফাইনাল পর্যায়ে খেলেছে ন বার। প্রাথমিক ধাপে নিজেদের দেশে লুক্সেমবুর্গকে হারিয়েছে ৩—০ গোলে, আর লুক্সেমবুর্গের মাটিতে ৪—১ গোলে, ফিনল্যাণ্ডে গিয়ে ফিনল্যাণ্ডকে ৩—০ গোলে এবং নিজেদের দেশে ৬—১ গোলে। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলায় নিজেদের দেশে ২—০ গোলে জিতেছে, ইংল্যাণ্ডে খেলতে গিয়ে ০—২ গোলে হেরেছে।

ইতালি ফুটবলে চিরদিনই সমৃদ্ধ। দেশে যেমন খুব ভাল-ভাল খেলোয়াড় আছেন, তেমন নানা দেশ থেকে নামী খেলোয়াড়দের এনে জড়ো করে দেশের নানা ক্লাবে। এখন তো আমেরিকার ক্লাবও কাঁড়ি-কাঁড়ি ডলার দিয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত খেলোয়াড়দের টানছে। আগে ইতালিই টেনেছে বেশি। স্পেনও অবশ্য বিদেশী খেলোয়াড়দের নিয়ে দারুণ সমৃদ্ধ।

ইতালির কিন্তু একটি দোষ আছে। বেশি বয়সের নামী খেলোয়াড়দের উপর বেশি আস্থা রাখে। তার ফলে সম্প্রতি বিশ্ব-কাপের অনেক খেলায় হার স্বীকার করেছে। এবারও দুই বর্ষীয়ান খেলোয়াড় বিশ্বখ্যাত ব্যাক ফ্যাচোত এবং গোলকীপার দিনোজফ দলে আছেন। অনেকেরই ধারণা, দুজনেরই গৌরবের দিন অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে।

হাঙ্গারি

পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে ফুটবলে হাঙ্গারির অপরিমেয় শক্তির কথা আগেই লিখেছি। তবু হাঙ্গারি বিশ্ব-ফুটবলে কোন-বার বিজয়ী হতে পারেনি। রানার্স হয়েছে ১৯৩৮ ও ১৯৫৪ সালে। এবার নিয়ে সাতবার ফাইনাল পর্যায়ে খেলছে। কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে বুদাপেস্টে গ্রীসকে ৩—০ গোলে হারালেও

পেলে অবসর নিয়েছেন। ব্রাজিল তবু দারুণ টীম। এবারকার ব্রাজিল এই টীম নিয়ে খেলছে।

গ্রীসের খেলা ১—১ গোলে ড্র হয়। রাশিয়াকে নিজেদের মাটিতে হারায় ২—১ গোলে, মস্কোতে রাশিয়ার কাছে হারে ০—২ গোলে। বলিভিয়াকে দুটি খেলাতেই হারিয়েছে। স্বদেশে ৬—০ গোলে, ওদের দেশে ৩—২ গোলে।

তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার মিশ্রণে এবং খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-দক্ষতায় হাঙ্গারি এখন খুবই শক্তিশালী দল। মিশ্রিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং বুদাপেস্টে প্রতি সোমবার খেলোয়াড়দের নানা দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলিয়ে কোচ লাজোস বারোটি তাঁর দলটিকে সুসংগঠিত করেছেন। মিডফীল্ডার টিবর নিসিলাসি অসাধারণ আক্রমণাত্মক মেজাজের খেলোয়াড়। হাঙ্গারি খেলছে ৪+৩+৩ ছকে। রাইট আউট লাজলো ফাজেকাস, লেফট আউট বেলা ভারাডি এবং স্ট্রাইকার আন্দ্রিয়াজ টরোকসিককে নিয়ে দুরন্ত আক্রমণ ক্ষমতা। গতিবেগের জন্য বেলা ভারাডি ইউরোপে খুদে এরোপ্লেন নামে পরিচিত। টরোকসিকও অসম্ভব ফাস্ট্। গোল করাতে এবং গোল করতে ওস্তাদ। দক্ষিণ আমেরিকার লাপাজে বলিভিয়াকে ওদের কাছে ০—৬ গোলে নাস্তানাবুদ হতে দেখে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার বহু খেলোয়াড়ই বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। হাঙ্গারির কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা প্রায় নিশ্চিন্ত।

ফ্রান্স

শক্তিশালী এক নম্বর গ্রুপে ফ্রান্সই অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন। মূলে খেলার সুযোগ পেয়েছে মাত্র দুটি খেলা জিতে। আয়ারকে হারায় ২—০ গোলে, আয়ারের কাছে হারে ০—১ গোলে। বুলগারিয়াকে নিজ মাটিতে হারায় ৩—১. গোলে। বুলগারিয়া ফ্রান্সের অপর খেলাটি ২—২ গোলে অমীমাংসিত থাকে।

বিশ্বকাপে ফ্রান্সের রেকর্ড খুব ভাল নয়, যদিও এবার নিয়ে সাতবার ফাইনাল পর্যায়ে খেলছে। তৃতীয় স্থান পেয়েছিল ১৯৫৮ সালে, মুখ্যত অসাধারণ ফরোয়ার্ড ফুস্ট ফনটাইনের কৃতিত্বে, ফাইনাল পর্যায়ে যাঁর ১৪টি গোল করার রেকর্ড এখনো অম্লান। এখন ফ্রান্সের রক্ষণভাগের তুলনায় আক্রমণভাগ কমজোরি। তার উপর মাস দেড়েক আগে কয়েকজন খেলোয়াড়ের চোট-আঘাত লেগেছে। ম্যানেজার মিচেল হিদালগোর তাই দুর্ভাবনার কারণ আছে। আর্জেন্টিনায় খেলার অধিকার অর্জনের পর ফ্রান্স এই খেলার সময় পর্যন্ত চোদ্দটি ম্যাচ খেলেছে। জিতেছে পাঁচটিতে, হেরেছে ছটি খেলায়। ড্র হয়েছে তিনটি ম্যাচ। ফ্রান্স যদি কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে, সেটা হবে অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

গ্রুপ—দুই

পশ্চিম জার্মানি, পোল্যান্ড, মেক্সিকো, টিউনিসিয়া

খেলার তারিখ ১ জুন—পশ্চিম জার্মানি ঃ পোল্যান্ড; ২ জুন—টিউনিসিয়া ঃ মেক্সিকো; ৬ জুন—মেক্সিকো ঃ পশ্চিম জার্মানি; পোল্যান্ড ঃ টিউনিসিয়া; ১০ জুন—টিউনিসিয়া ঃ পশ্চিম জার্মানি মেক্সিকো ঃ পোল্যান্ড।

পশ্চিম জার্মানি

অনেকের ধারণা, গত প্রতিযোগিতার বিজয়ী পশ্চিম জার্মানি এবারও বিশ্বকাপ জিতবে। অথবা ব্রাজিল। অর্থাৎ পশ্চিম জার্মানি এবং ব্রাজিল এবার ফেভারিট।

কিন্তু বেশ কিছু ফুটবল পণ্ডিতের অভিমত, দুই নম্বর গ্রুপের লীগ টেবলে পোল্যান্ড যদি পশ্চিম জার্মানির উপরে স্থান পায়, আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। পশ্চিম জার্মানির কি সেই ৭৪-এর দল আছে? কসমস ক্লাব থেকে ফ্রানৎস বেকেনবাউয়ারকে ফিরিয়ে এনে, এই লেখার সময় পর্যন্ত, দলের সঙ্গে প্র্যাকটিস করানো সম্ভব হয়নি।

গতবারের বিজয়ী বলেই পশ্চিম জার্মানিকে প্রাথমিক পর্যায়ে

যারা কচি কাঁচা তাদের ত্বকের

নিরাপত্তার জন্য চাই

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

ছোটদের নিয়ে মেলাই ঝক্কি ঝামেলা। আর এক দুর্ভাবনা তাদের কোমল ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষা। জীবাণু সংক্রমণের ভয় তাদের ক্ষেত্রেই বেশি। মায়েদের সব ভাবনা থেকে ছুটি দিল বোরোলীন। কাটা ছেঁড়া ফাটায় অনবদ্য। রুক্ষ, শুষ্ক কিংবা ঝলসানো ত্বকেও অদ্ভুত কাজ করে

বোরোলীন

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড • বোরোলীন হাউস • কলিকাতা-৭০০ ০০৩

খেলতে হয়নি। সে প্রস্তুত হয়েছে আন্তর্জাতিক কয়েকটি ম্যাচের মাধ্যমে। ওয়েম্বলিতে ইংল্যান্ডকে ২—১ গোলে এবং ফ্রাঙ্কফুর্টে রাশিয়াকে ১—০ গোলে জার্মানির যে দলটি হারিয়েছে, সেই দলে ৭৪-এর বিশ্বকাপের পাঁচ-ছয়জন খেলোয়াড় ছিলেন। এ'রা হচ্ছেন গোলকীপার মাইয়ার, ব্যাক ভগটস, সুইপার সোয়ারজেনবেক, লিংকম্যান বনহফ, স্ট্রাইকার জোয়েলজের্নাবিন। বার্টি ভগটস্ এখন জাতীয় দলের অধিনায়ক। ফুটবলের জ্ঞানবৃদ্ধ বিদগ্ধ পণ্ডিত সেই হেলমুট শ্যেন এখনো কোচ। শ্যেনের হাতে দক্ষ খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনেক এবং জার্মানদের লড়াইয়ের ক্ষমতা তুলনাহীন। সুতরাং বিশ্বকাপ তারা জিততেও পারে। পশ্চিম জার্মানি ন'বার ফাইনাল পর্যায়ে খেলছে। একদিক দিয়ে ব্রাজিলের চেয়েও পশ্চিম জার্মানির রেকর্ড ভাল। বিজয়ী হয়েছে দুবার (১৯৫৪ ও ১৯৭৪), রানার্স একবার (১৯৬৬), তৃতীয় স্থান পেয়েছে দুবার (১৯৩৪ ও ১৯৭০) এবং চতুর্থ স্থান একবার (১৯৫৮)।

পশ্চিম জার্মানির ম্যুলার

ব্রাজিলের জিকো (নতুন পেলে?)

পোল্যান্ড

গতবারের বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান পেয়েছিল পোল্যান্ড। এবার নিয়ে তৃতীয়বার ফাইনাল পর্যায়ে খেলছে। প্রাথমিকে হারিয়েছে সাইপ্রাসকে ৫—০ ও ৩—১ গোলে, ডেনমার্ককে ২—১ ও ৪—১ গোলে এবং পর্তুগালকে ২—০ গোলে। পর্তুগালের সংগে শুধু একটি খেলা ১—১ ড্র করেছে। পোল্যান্ড দলের ম্যানেজার জ্যাসেক মক-এর হাতে এবার বহু ভাল খেলোয়াড় আছেন। ৩০ বছর বয়সী মিডফীল্ড খেলোয়াড় এবং অধিনায়ক কাজিমিয়েরেজ দেনা তো এ পর্যন্ত একশোর বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। বোয়েনিক, লাটো, কাস্টো, মাজুর, আন্দ্রেজেজ— ওদের সব দারুণ ফরোয়ার্ড। পৃথিবীতে কোটি টাকা দামের যে-সব খেলোয়াড় আছেন, স্ট্রাইকার আন্দ্রেজেজ তাঁদেরই একজন। স্টপার ব্যাক জার্জি গরগনও অসাধারণ খেলোয়াড়। মনে হয় পোল্যান্ড সেমিফাইনাল পর্যায়ে পে'ছিবেই।

মেক্সিকো

ফাইনাল পর্যায়ে খেলছে ৮ বার। এবার প্রাথমিকের ফল : আমেরিকার সংগে ০—০ ও ৩—০। কানাডার সংগে ০—১, ০—০, ও ৩—১। হাইতিকে ৪—১, এল সালভাডোরকে ৩—১. সুরিনামকে ৮—১ ও গুয়াতেমালাকে ২—১ গোলে পরাজিত করে। হুগো স্যানচেজ মেক্সিকোর সবচেয়ে নামী ফরোয়ার্ড। ম্যানেজার জোস অ্যান্টোনিও রোকা আর্জেন্টিনায় যাবার আগে প্রচুর আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলিয়ে দলটিকে প্রস্তুত করেছেন। তবে মনে হয় না, মেক্সিকো উপরের ধাপে পে'ছিতে পারবে।

টিউনিসিয়া

টিউনিসিয়া এই প্রথম খেলছে বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায়ে। কীভাবে যোগ্যতা পেয়েছে? আফ্রিকা অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ন হয়ে। খেলার ফল : মরক্কোর সংগে ১—১ ও ৫—৩ আলজিরিয়ার সংগে ২—০ ও ১—১ গিনির সংগে ০—১ ও ৩—১ নাইজিরিয়ার সংগে ০—০ ও ১—০ মিশরের সংগে ২—৩ ও ৪—১। টিউনিসিয়ার ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় ফুটবল খেলার অভিজ্ঞতা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। তবু গোলকীপার ও অধিনায়ক সাদক অটোগা এই লেখার সময় পর্যন্ত ১৭৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। মিডফীল্ড খেলোয়াড় তারেক এ বছর আফ্রিকার 'ফুটবলার অব দি ইয়ার'-এর সম্মান পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, টিউনিসিয়াকে গ্রুপ লীগ থেকেই বিদায় নিতে হবে।

গ্রুপ — তিন

ব্রাজিল, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, স্পেন

খেলার তারিখ ৩ জুন—সুইডেন : ব্রাজিল স্পেন : অস্ট্রিয়া ; ৭ জুন—স্পেন : ব্রাজিল অস্ট্রিয়া : সুইডেন : ১১ জুন—ব্রাজিল : অস্ট্রিয়া সুইডেন : স্পেন।

ব্রাজিল

এর আগে বিশ্বফুটবলের ফাইনাল পর্যায়ে খেলেছে পৃথিবীর মোট ৪৫টি দেশ। এবার ইরান ও টিউনিসিয়াকে নিয়ে ৪৭টি দেশ খেলবে। ব্রাজিলই একমাত্র দেশ যারা প্রতিবারই ফাইনাল পর্যায়ে খেলছে। জানই তো, এবার হচ্ছে বিশ্বকাপের একাদশ প্রতিযোগিতা। অন্যান্য সব দেশের চেয়ে তোমরা ব্রাজিলের কথাই হয়তো বেশি জানো। অনেকের ধারণা ব্রাজিল এবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রাজিলের খেলার ফলগুলি দ্যাখো। কলম্বিয়ার সংগে ওদের দেশে গিয়ে ০—০ ড্র করল। নিজেদের দেশে হারাল ৬—০ গোলে। প্যারাগুয়েকে ১—০ হারিয়ে দ্বিতীয় খেলাটি ১—১ ড্র করল। পেরুকে হারিয়েছে ১—০ ও বলিভিয়াকে ৮—০ গোলে। গত ১৯ এপ্রিল ওয়েম্বলিতে ইংল্যান্ডের সংগে ১—১ ড্র করেছে, যে ইংল্যান্ড ফাইনাল পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

তাহলে কি ব্রাজিল গ্রুপ থেকেই বাতিল হয়ে যাবে? সুইডেনের শক্তিই বা কত? ওই ১৯ এপ্রিল তারিখেই স্টকহোমে

হল্যান্ডের যোহান ক্রুইফ

সুইডেন ৩—১ গোলে হারিয়েছে পুরো শক্তির পশ্চিম জার্মানি দলকে। সুতরাং বলা বেশ শক্ত তিন নম্বর গ্রুপ থেকে কোন্ দুটি দেশ পরবর্তী পর্যায়ে খেলবে। এই লেখাটা তৈরি করার সময় খবর এসেছে ব্রাজিলের ম্যানেজার ক্রডিও কুটিনহো বেশ কিছু খেলোয়াড় অদলবদল করেছেন। মিউফীল্ডার রিভেলিনো সবচেয়ে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। ফরোয়ার্ড জিকো নাকি দ্বিতীয় পেলে হতে পারেন। সবচেয়ে বেশি গোল করেন রবার্টো, আর এক গোলকরনেওয়ালা ফরোয়ার্ড। তবে ম্যানেজারের মতে দুজনই নাকি বেশি সময় পায়ে বল রেখে খেলার গতি মন্থর করেন। ব্রাজিলে অবশ্য ট্যালেন্টেড খেলোয়াড়ের ঘাটতি নেই। যদি বিশ্বকাপ জেতেও, অনেক শক্ত বাধা ডিঙোতে হবে।

অস্ট্রিয়া

অস্ট্রিয়া এর আগে তিনবার ফাইনাল পর্যায়ে খেলেছে। চতুর্থ স্থান পেয়েছে ১৯৩৪-এ, তৃতীয় ১৯৫৪ সনে। এবার প্রাথমিকে শক্তিশালী পূর্ব জার্মানির সঙ্গে দুটি খেলা ১—১ ড্র করেছে। মাল্টাকে হারিয়েছে ১—০ ও ৯—০ গোলে, তুরস্ককে ১—০ ও ১—০ গোলে। দু বছরের মধ্যে তেরোটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে হার স্বীকার করেনি। ম্যানেজার সেনেকোউইশের হাতে নামী-দামী খেলোয়াড়ও প্রচুর। সবচেয়ে নামী খেলোয়াড় স্ট্রাইকার হ্যানস ক্রাঙ্কল, কয়েকটি ক্লাব যাঁকে ৪৮ লক্ষ টাকায় কিনতে চেয়েছে। মাল্টার বিরুদ্ধে একাই ছ'টি গোল করেন ক্রাঙ্কল। অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার যথেষ্ট সম্ভাবনা। অস্ট্রিয়ার খেলার ছক ৪+৩+৩।

সুইডেন

সুইডেন ১৯৩৮-এ চতুর্থ, ১৯৫০-এ তৃতীয় এবং ১৯৫৮ সনে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। এবার নিয়ে সাতবার ফাইনাল পর্যায়ে খেলছে। প্রাথমিকে সুইজারল্যান্ডকে হারিয়েছে ২—১ ও ২—১ গোলে। নিজেদের দেশে নরওয়েকে ২—০ হারিয়ে পাল্টা খেলায় ১—২ গোলে হেরেছে। আক্রমণ ও রক্ষণ দুই বিভাগ সমশক্তির। বেশ ব্যালান্সড সাইড। পশ্চিম জার্মানিকে যে-দল ৩—১ গোলে হারাতে পারে, সে-দলের শক্তি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

স্পেন

বহু অসাধারণ ফুটবলারে স্পেন সমৃদ্ধ হলেও রেকর্ড মোটেই ভাল নয়। ১৯৫০-এ শুধু চতুর্থ স্থান পেয়েছিল। এবার নিয়ে পাঁচবার ফাইনাল পর্যায়ে খেলছে। যোগ্যতা পেয়েছে যুগোস্লাভিয়াকে ১—০ ও ১—০ গোলে হারিয়ে এবং রুমানিয়াকে একটি খেলায় ২—০ হারিয়ে ও একটি খেলায় ০—১ হেরে। ট্রেনার লাডিস্লাও কুবালা তরুণ ও অভিজ্ঞদের সমাবেশে দলটি সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়েছেন। নামী ডিফেন্ডার জোস ক্যামাচো লিগামেন্ট অপারেশনের পর আবার দারুণ খেলছেন। সুইপার পিরিরও এখন দারুণ ফর্ম।

গ্রুপ—চার

হল্যান্ড, ইরান, স্কটল্যান্ড, পেরু

খেলার তারিখ ঃ ৩ জুন—হল্যান্ড ঃ ইরান; পেরু ঃ স্কটল্যান্ড; ৭ জুন—হল্যান্ড ঃ পেরু; স্কটল্যান্ড ঃ ইরান; ১১ জুন—হল্যান্ড ঃ স্কটল্যান্ড; পেরু ঃ ইরান।

হল্যান্ড

অনেকেই ধরে নিয়েছিল, হল্যান্ডই ১৯৭৪-এর বিশ্বকাপ জিতবে। কেননা ওদের খেলার মধ্যে ছিল আগামী শতকের ফুটবলের ছক। শুধু গোলকীপার বাদে বাকি দশজন যে কোন পজিশনে খেলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। পরস্পর

জায়গা বদল করে খেলেছিলেনও তেল-খাওয়ানো একটি মেশিনের মতো। তা সত্ত্বেও কিন্তু হল্যান্ড ফাইনালে হেরে গেল। এবারে ফাইনাল পর্যায়ে চতুর্থবারে হল্যান্ড কী করবে এখনো বলা যাচ্ছে না। কারণ, আগেই বলেছি, ক্রুইফ ও নীসকেনসকে না পেলে দল দুর্বল হবে। তবু পেরু ও ইরানের উপরে টেক্কা দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছনর মতো খেলোয়াড় হল্যান্ডে রয়েছেন। গোল-কীপার স্রাইভারস, ব্যাক সুরবিরায়, স্টপার ক্রল, মিডফীল্ডার পিটারস, ভ্যান ডার কারহপ এবং ফরোয়ার্ড সেউ লা লিং ও রেনসেনব্রিঙ্ক যথেষ্ট গুণী ফুটবলার। লিং-এর জন্ম হেগে, কিন্তু এক চীনা বংশে। উদীয়মান ফুটবল-প্রতিভা। দুই আউটেই সমান দক্ষ। এবার প্রাথমিকে হল্যান্ড হারায় আইসল্যান্ডকে ১—০ ও ৪—১ গোলে, বেলজিয়মকে ২—০ ও ১—০ গোলে এবং একটি খেলায় উত্তর আয়ারল্যান্ডকে ১—০ গোলে। আয়ার-ল্যান্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় খেলা ২—২ গোলে অমীমাংসিত থাকে।

স্কটল্যান্ড

স্কটল্যান্ডই বিগত বিশ্বকাপের একমাত্র দল, যারা কোন ম্যাচ না হেরে গ্রুপ থেকে বিদায় নিয়েছিল। আর্জেন্টিনায় ইংল্যান্ড দলের অনুপস্থিতি কিছুটা পূরণ করবে স্কটল্যান্ড। কেননা ইংল্যান্ডের প্রথম ডিভিশনের নামী খেলোয়াড়দের নিয়েই স্কটল্যান্ড দল। সত্তর-আশি লক্ষ টাকা দামের বহু খেলোয়াড় রয়েছেন, যাঁরা দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলবেনই ধরে নেওয়া যায়। কেনি ডালগলিস, আর্চি জেসেল মার্টিন, বকান, ডন ম্যাসন, গর্ডন ম্যাককুইন, কেভিন কিগান—সবাই বিশ্ব-ফুটবলের নামডাকের খেলোয়াড়। স্কটল্যান্ড এবার নিয়ে চতুর্থবার ফাইনাল পর্যায়ে খেলছে। প্রাথমিকে ওয়েলসকে হারিয়েছে ১—০ ও ২—০ গোলে। চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে একটি খেলায় ০—২ হেরেছে, একটি খেলায় ৩—১ জিতেছে।

পেরু

দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশের মতো ফুটবলে পেরুও শক্তিশালী। দেশে কৃতী খেলোয়াড়ও প্রচুর, কিন্তু বিশ্ব-ফুটবলে পেরুর রেকর্ড নেই। এবার নিয়ে তৃতীয়বার ফাইনাল পর্যায়ে খেলছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, চার নম্বর গ্রুপে পেরু তিন নম্বর স্থান পেতে পারে। লিঙ্কম্যান টিওফিলো কুবিলাস, জোস ভ্যালাসকুয়েজ, রাউল গরিটির যথেষ্ট নাম আছে। ফরোয়ার্ড জুয়ান অবলিটাস দলের টপ স্কোরার। জুয়ান সুনেটি নাকি এখন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ উইঙ্গার। পেরু এবার প্রাথমিকে ইকুয়েডরের সঙ্গে ১—১ ড্র করে এবং দ্বিতীয় খেলায় ৪—০ জেতে। চিলির সঙ্গে ১—১ ড্র ও ২—০ জয়। ব্রাজিলের কাছে ০—১ পরাজয় এবং বলিভিয়ার বিরুদ্ধে ৫—০ জয়।

ইরান

এশিয়া, ওশেনিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায়ে প্রথম খেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইরানকে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলতে হয়েছে। মোট বারোটি। সৌদি আরবকে হারায় ৩—০ ও ২—০, সিরিয়াকে ১—০ ও ২—০ হংকংকে ২—০ ও ৩—০, কুয়েতকে ১—০ ও ২—১ এবং অস্ট্রেলিয়াকে ১—০ গোলে। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে শুধু দুটি খেলা ড্র করে ০—০ ও ২—২ গোলে। ইরান অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফুটবলে অনেক এগিয়ে গেছে। তবু দ্বিতীয় পর্যায়ে উঠবে, এমন ধারণা ট্রেনার হেসমত মোহজেরানিরও নেই। সম্প্রতি ফুটবল-সম্রাট পেলে গিয়েছিলেন তেহরান সফরে। আগেই তো লিখেছি, শুধু বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায়ে খেলার জন্যই ইরানের এক-একজন খেলোয়াড়কে কুড়ি লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। পেলের সফরকালেও খেলোয়াড়দের নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে আর্জেন্টিনায় প্রাণপণ লড়ার জন্য।

ফুটবল-শব্দ সন্ধান

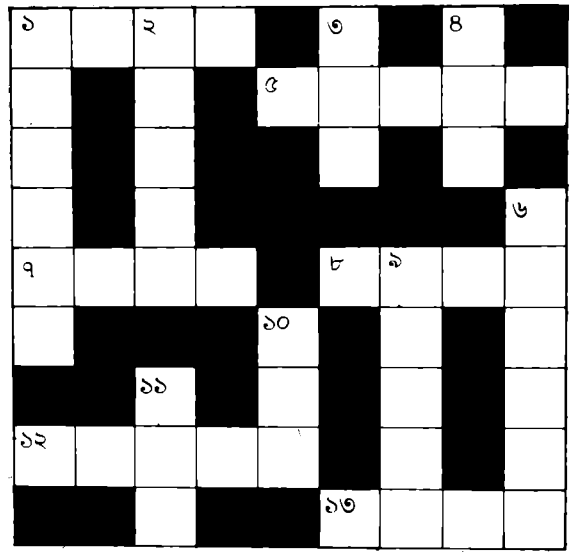

এবারের শব্দ-সন্ধান বিশ্বকাপ-ফুটবল উপলক্ষে। পৃথিবীর চোদ্দজন ডাকসাইটে খেলোয়াড়ের নাম বসিয়ে পূরণ করতে হবে এই ছক। তোমরা যারা ফুটবলের পোকা—মানে দুনিয়ার খোঁজখবর রাখো—তারা তো অতি সহজেই সেরে ফেলবে কাজটা, সে কি আর জানি না!

সংকেত : **পাশাপাশি :** (১) হাঙ্গারির খেলোয়াড়; এক সময় এঁর নামের সঙ্গে আরও দুজন ঐ দেশের খেলোয়াড়ের নাম এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হত। (৫) পশ্চিম জার্মানির এক বিখ্যাত খেলোয়াড়। (৭) আগে ফুটবলই খেলতেন, তবে তেমন নাম করতে পারেননি। এখন অন্য খেলায় জগৎজোড়া নাম। (৮) ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়। নামের প্রথমটুকুর সঙ্গে আর-এক ইংরেজ খেলোয়াড়ের নামের মিল আছে। (১২) নামে তিনটে স্বরবর্ণ। (১৩) হাঙ্গারির এই খেলোয়াড়ের নামডাক পেলের মতোই ছিল প্রায়।

উপর-নীচ : (১) ইংল্যান্ডের বিখ্যাত খেলোয়াড় বিশ্বকাপে খেলেছেন। (২) ইনিও ইংল্যান্ডের খুব নামী খেলোয়াড়। (৩) গত বিশ্বকাপে যে-দেশ সাড়া জাগিয়ে-ছিল, সেই দেশের ক্যাপটেন। (৪) গত বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলায় এঁর গোলেই জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়। (৬) পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাইট ব্যাক বলা হয় এঁকে। (৯) হল্যান্ডের মিডফীল্ডার। (১০) ব্রাজিলের আর-এক পেলে। (১১) ইতালির এই খেলোয়াড়ের নামের উচ্চারণে মাঝের অক্ষর 'স' না 'চ' হবে? আমি অবশ্য 'স'-ই রাখলাম।

(সমাধান ছেচল্লিশের পাতায়)

বিশ্বকাপ ফুটবল / পশ্চাৎপট

দুই জার্মানি • ইংল্যাণ্ড • স্কটল্যাণ্ড • সুইডেন

শ্যামসুন্দর ঘোষ

"ওঠো।...আমাদের আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।...দ্যাখো, ওই যে ওরা, চিন্তায় আকুল। ওরা ফুরিয়ে গেছে।"

না, উপরের কথাগুলি কোনও সেনাধ্যক্ষের নয়। যদিও সেইরকমটাই মনে হয়। আসলে একজন সার্জেন্ট-মেজর যে-ভাবে রণক্লান্ত, হতোদ্যম সেনানীদের প্রাণে নবীন উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেন, একজন ফুটবল-প্রশিক্ষক ঠিক সেইভাবেই তাঁর দলের খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিচ্ছিলেন। কোচটির নাম স্যার আলফ রামজে। বলা বাহুল্য, দলটি ইংল্যান্ড। ১৯৬৬-র ৩০ জুলাই ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালের শেষ মুহূর্তে পশ্চিম জার্মানি গোল শোধ দিয়ে ফল ২—২ করার পর ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা স্বাভাবিকভাবেই মুষড়ে পড়েছিলেন কিছুটা। অতিরিক্ত সময় খেলতে কার আর উৎসাহ থাকে? তখন এইভাবেই স্যার আলফ তাঁদের জাগিয়ে তুলেছিলেন, যাতে তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন 'ফুরিয়ে-যাওয়া' পশ্চিম জার্মানির উপর।

সেদিন রামজের উৎসাহদান বৃথা হয়নি। ইংল্যান্ড যেন নতুন শক্তিতে জেগে উঠে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করল। অতিরিক্ত সময়ে জিওফ হার্স্ট দু'টি গোল করলেন। প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেল ইংল্যান্ড। এ-পর্যন্ত বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের এটাই একমাত্র সাফল্য। আর হার্স্ট-ই এখনও একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি বিশ্বকাপ ফাইনালে তিনটি গোল করেছেন।

খেলোয়াড়দের উদ্দীপ্ত করতে স্যার আলফ পশ্চিম জার্মানি দল সম্বন্ধে সেদিন যা বলেছিলেন, সেটা সত্যি ছিল কিনা জানি না। তবে ফুটবল-শক্তি হিসেবে পশ্চিম জার্মানি যে সত্যিই ফুরিয়ে যায়নি তার প্রমাণ তারা রাখে পরের বার। ইংল্যান্ডকেই হারিয়ে দিয়ে। শুধু তাই নয়, ১৯৭৪ সালে পরাক্রান্ত হল্যান্ডকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ পেয়েছে তারা।

বিশ্ব-ফুটবল-আসরে ব্রাজিল ও ইতালির মতো অন্যতম সেরা ফুটবল-দেশ হিসাবে চিহ্নিত পশ্চিম জার্মানির প্রথম সাফল্য আসে ১৯৫৪ সালে— হাঙ্গারির মতো শক্তিশালী দেশকে ফাইনালে ৩—২ গোলে পরাজিত করে। ১৯৫৮ ও ১৯৭০ সালে পরাজিত হয় সেমি-ফাইনালে। ১৯৬২ সালে চিলিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে হার স্বীকার করে যুগোস্লাভিয়ার কাছে।

পশ্চিম জার্মানির প্রথম সাফল্য শুধু ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে ফাইনালে হাঙ্গারির পরাজয় অপ্রত্যাশিত। কারণ, প্রথমত, হাঙ্গারির ঐ সময়কার ফুটবল দল ইউরোপীয় ফুটবলে সেরা দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চাশের দশকে পুসকাস, হিদেকুটি, বুজানস্কি, বর্সজিক ও স্যানডর কোসিসের হাঙ্গারি দলের কাছে ইউরোপের সেরা-সেরা দলগুলি তখন হার স্বীকার করছে। এই দলের কাছেই ইংল্যান্ড পরাজিত হয় ৩—৬ গোলে, যেটা দেশের মাটিতে একটি বিদেশী দলের কাছে ইংল্যান্ডের প্রথম পরাজয়। দ্বিতীয়ত পশ্চিম জার্মানি ঐবছর গ্রুপ লীগে হাঙ্গারির কাছে পরাজিত হয় ৩—৮ গোলে। যে-কোনো খেলায় সাফল্য বা ব্যর্থতার পিছনে প্রশিক্ষণের যে বিশেষ ভূমিকা থাকে, তার প্রমাণ রেখেছেন জার্মানির হারবারজার। তিনি ইচ্ছে করেই হাঙ্গারির বিরুদ্ধে গ্রুপের খেলায় দুর্বল দল নামিয়েছিলেন। তাই হাঙ্গারি ও পশ্চিম জার্মানি যখন ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নামল, তখন একদিকে হাঙ্গারির খেলোয়াড়দের মধ্যে যেমন আত্মতুষ্টির মনোভাব লক্ষ করা গিয়েছিল, অপরদিকে তেমনি হারবারজার ও অধিনায়ক ওয়ালটারের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানি দল সংগ্রামের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছিল। অবশ্য

হাঙ্গারি দলের খেলোয়াড়েরা পরাজয়ের জন্য রেফারীকে দায়ী করেছে। অভিযোগ তুলেছিল, পুসকাসের একটি ন্যায্য গোল রেফারী অন্যায়ভাবে নাকচ করেছেন।

সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে যে-দুটি খেলা বিশেষ স্মরণীয় হয়ে থাকবে, সেই দুটির সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে পশ্চিম জার্মানির নাম। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলার আগে পর্যন্ত জার্মানি ন'টি খেলার মধ্যে আটটিতে পরাজিত হয়েছিল। বাকি খেলাটি শেষ হয়েছিল অমীমাংসিতভাবে। কিন্তু ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও পশ্চিম জার্মানি ক্ষুরধার প্রতিযোগিতা গড়ে তোলে। আগেই লিখেছি কীভাবে শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ে ইংল্যান্ড জয়লাভ করে। পরের বিশ্বকাপ আসরে প্রায় একইভাবে পশ্চিম জার্মানির কাছে পরাজিত হতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে। কোয়ার্টার-ফাইনালের খেলায় অতিরিক্ত সময়ে পশ্চিম জার্মানি ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে ৩—২ গোলে। আবার সেমি-ফাইনাল খেলায় ইতালির কাছে পশ্চিম জার্মানিকে পরাজিত হতে হয়েছে ৩—৪ গোলে, যে-খেলাকে বিশেষজ্ঞরা শতাব্দীর সেরা খেলা হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই খেলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে অতিরিক্ত সময়ে। আর নাটকীয় উত্তেজনার মধ্যে। অতিরিক্ত সময়ে ইতালি করে তিনটি গোল, আর পশ্চিম জার্মানি দুটি। এই খেলায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন বেকেনবাউয়ার। বেকেনবাউয়ার আহত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে শেষ পর্যন্ত খেলতে হয়েছে। কারণ তাঁর আঘাত লাগার আগেই জার্মানির দুজন খেলোয়াড়কে বদল করা হয়েছিল। বেকেনবাউয়ার ছাড়া আর যে খেলোয়াড়ের নাম পশ্চিম জার্মানির লোকেদের মুখে-মুখে ঘোরে, তিনি হলেন সেন্টার ফরোয়ার্ড ইউ সেলার। পরপর চারটি বিশ্বকাপে (১৯৫৮,

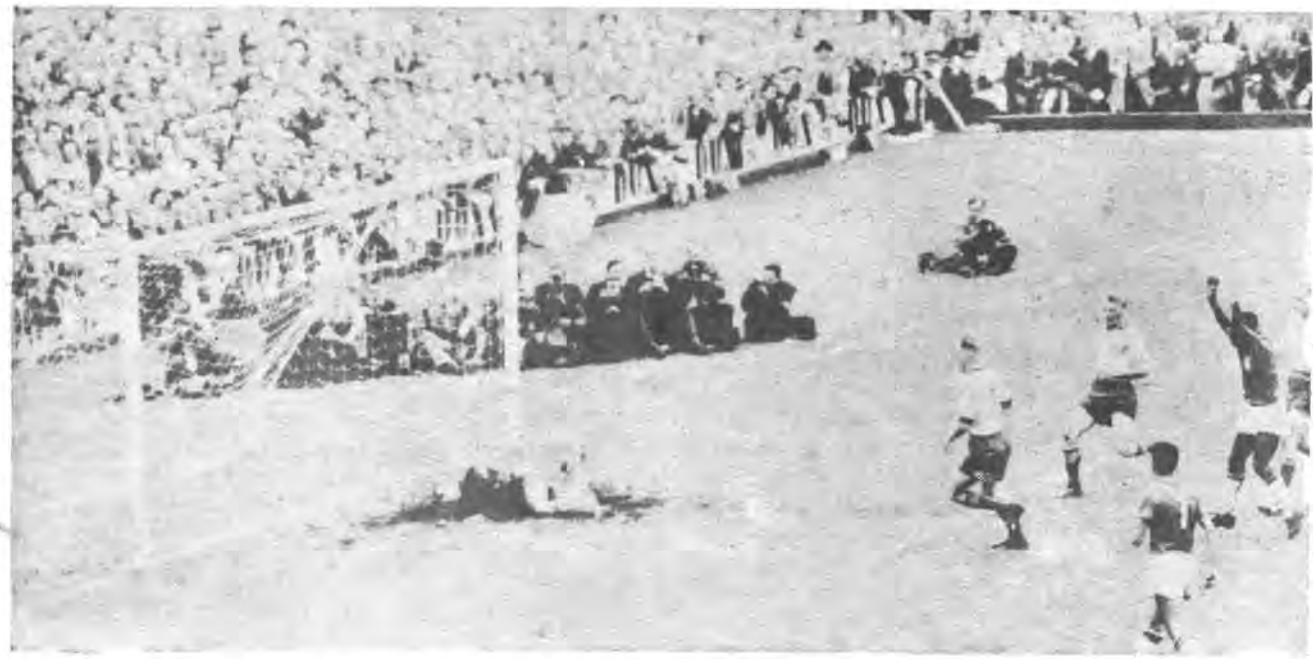

আটান্নর বিশ্বকাপ-ফাইনালে সুইডেনের গোলে বল ঢুকিয়েছেন সতেরো বছরের পেলে (ডাইনে)

১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৭০) সেনার পশ্চিম জার্মানির পক্ষে একটি মস্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এবছর পশ্চিম জার্মানি রয়েছে ‘খ’ গ্রুপে। পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে এই একই গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে পোল্যান্ড, টিউনিসিয়া ও মেক্সিকো। অঘটন না ঘটলে পশ্চিম জার্মানির ও পোল্যান্ডেরই কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা। পর্তুগালের সঙ্গে পোল্যান্ডের ফিরতি খেলাটি শেষ হয়েছে ১—১ গোলে। জার্মানি ও পোল্যান্ড খেলছে প্রথমদিন, অর্থাৎ ১ জুন। উল্লেখ্য, গত তিনটি বিশ্বকাপে (৬৬, ৭০ ও ৭৪) এই দুটি দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে মিলিত হলেও প্রতি বছরই খেলা শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে।

পশ্চিম জার্মানির ফুটবল-দলগুলির মত খেলোয়াড়দের পিছনে দুহাতে অর্থব্যয় না করলেও পূর্ব জার্মানি কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ইতিমধ্যেই নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৯৭৬ সালে মন্ট্রিল অলিম্পিকে পূর্ব জার্মানির অসামান্য সাফল্য এই কথাই প্রমাণিত করে। পশ্চিম বাংলার চেয়ে কম জনসংখ্যার দেশ পূর্ব জার্মানি অলিম্পিক আসর থেকে দুহাতে পদক লাভ করেছে। ফুটবলে পেয়েছে স্বর্ণ পদক। ১৯৭২ সালে ম্যুনিখে পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক। বিশ্ব-ফুটবল-আসরে মূল প্রতিযোগিতায় পূর্ব জার্মানি অবশ্য মাত্র একবারই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সুযোগ পেয়েছে। ১৯৭৪ সালে সেই প্রথম সুযোগে পূর্ব জার্মানি বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল প্রতিযোগিতার বিজয়ী পশ্চিম জার্মানিকে গ্রুপ লীগের খেলায় হারিয়ে। এবছর অল্পের জন্য পূর্ব জার্মানি মূল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়নি। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রিয়া থেকে মাত্র এক পয়েন্ট পিছিয়ে থাকায় পূর্ব জার্মানি এ-সুযোগ হারাল। অস্ট্রিয়া ও পূর্ব জার্মানির দুটি খেলাই শেষ হয়েছে ১—১ গোলে। কিন্তু পূর্ব জার্মানি আরও একটি পয়েন্ট নষ্ট করেছে তুরস্কের সঙ্গে। নিজেদের মাটিতে ১—১ গোলে খেলা শেষ করে। পূর্ব জার্মানির ব্যর্থতার জন্য অনেকে প্রশিক্ষক বুসেনরকে দায়ী করেছে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দুটি খেলাতেই পূর্ব জার্মানি রক্ষণাত্মক ক্রীড়াধারার পরিচয় দেয়। আর তাছাড়া স্ট্রাইকার জোহিম স্ট্রেচকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দুটি খেলাতে না নামানো যে ভুল হয়েছে, তার প্রমাণ মিলেছে মালটার বিরুদ্ধে স্ট্রেচের নয়নাভিরাম ক্রীড়াধারায়। স্ট্রেচ দ্বিতীয় খেলাতে নেমে একাই করেছেন তিনটি গোল, এবং আরও তিনটি গোলের ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা স্মরণীয়। পূর্ব জার্মানি এই খেলায় জয়লাভ করেছিল ৯—০ গোলে।

পূর্ব জার্মানির বিদায়ের মতই দুঃখজনক ঘটনা হল ফুটবলের জনক ইংল্যান্ডেরও গ্রুপ লীগে বিদায় নেওয়া। ইতালির সঙ্গে সমান পয়েন্ট পেয়েও ইংল্যান্ডকে প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে

পশ্চিম জার্মানির মুলারের এই গোলের পরিণামে সত্তরের বিশ্বকাপ থেকে ইংল্যান্ডকে বিদায় নিতে হয়

ইংল্যান্ড জিতেছে (১৯৬৬)। আনন্দে বিহ্বল ববি মুরের হাতে জুলে রিমে কাপ

হয়েছে গোল-পার্থক্যের জন্য। ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ-বিজয়ী ইংল্যান্ড ১৯৭০ সালে কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির কাছে যে হার স্বীকার করেছে, তার উল্লেখ আগেই করেছি। ১৯৭৪ সালে বিশ্বকাপের খেলায় ইংল্যান্ড অংশ নেয়নি, আর এবছর ইতালি ও ইংল্যান্ড, দুটি দেশই দশটি করে পয়েন্ট পেলেও ইতালির গোলসংখ্যা যেখানে ১৮—৪, ইংল্যান্ডের সেখানে ১৫—৪। ইতালির কাছে প্রথম খেলায় ইংল্যান্ড পরাজিত হয়েছিল

০—২ গোলে। ফিরতি খেলায় ইংল্যান্ড জেতে ২—০ গোলে।

ইংল্যান্ডের মত দুবারের রানার্স আপ চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাথমিক রাউন্ডে বিদায়ও বিস্ময়কর ব্যাপার। ইউরোপীয় ফুটবলে অন্যতম শীর্ষস্থানে অবস্থিত চেকোস্লোভাকিয়া এই নিয়ে উপর্যুপরি দুবার স্কটল্যান্ডের কাছে পরাজিত হয়ে মূল প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। চেকোস্লোভাকিয়ার বিশ্বকাপ-ফুটবল-আসরে প্রবেশ ১৯৩৪ সালে, এবং প্রথমবারই তারা রানার্স আপের সম্মান লাভ করে। এবারে তিন দলের গ্রুপ লীগের লড়াইয়ে স্কটল্যান্ড যেখানে পেয়েছে ৬ পয়েন্ট সেখানে চেকোস্লোভাকিয়ার পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৪। ওয়েলস সংগ্রহ করেছে দুই পয়েন্ট। স্কটল্যান্ড প্রথম খেলায় চেকোস্লোভাকিয়াকে ৩—১ গোলে হারালেও ফিরতি খেলায় চেকোস্লোভাকিয়া জেতে ২—০ গোলে। কিন্তু যেখানে স্কটল্যান্ড ওয়েলসের কাছে দুটি খেলাতেই জিতেছে, সেখানে চেকোস্লোভাকিয়া ওয়েলসের কাছে একটিতে হারে (০—৩) ও অপরটিতে জেতে (৩—০)।

বিশ্বফুটবল-আসরে স্কটল্যান্ড কিন্তু এখনও কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। বিশ্বফুটবলে তার প্রথম প্রবেশ ১৯৫০ সালে। ঐ বছর অবশ্য ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স আপের সম্মান পেয়েও শেষ পর্যন্ত স্কটল্যান্ড প্রতিযোগিতা থেকে সরে গিয়েছে। কারণ আগেই তারা ঘোষণা করেছিল, চ্যাম্পিয়ন হলেই তারা মূল আসরে অংশ নেবে। ১৯৫৪-৫৮ সালে স্কটল্যান্ড একটি খেলাতেও জিততে পারেনি। শুধু তাই নয়, উরুগুয়ের কাছে ৭—০ গোলে পরাজিত হয়েছে। ৬২, ৬৬, ৭০—কোনোবারেই তারা মূল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়নি। তবে মূল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ না পেলেও ১৯৬৬ সাল থেকে তারা ফুটবলে অন্যতম শক্তিশালী দেশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই নিয়ে পরপর দুবার স্কটল্যান্ড মূল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পেল।

স্কটল্যান্ডের ঘরোয়া ফুটবল-আসরে সেল্টিক ও রেঞ্জার্স দুটি শক্তিশালী দল। কলকাতায় যেমন ঘরোয়া ফুটবল আসরে ইস্টবেংগল এবং মোহনবাগানের খেলাকে ঘিরে সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা যায়, ঠিক তেমনি স্কটল্যান্ডের এই দুই দলের মধ্যে খেলাকে ঘিরে প্রায়ই সমর্থকদের হাতাহাতি হয়। গত চুয়াত্তর বছর ধরেই চলেছে রেঞ্জার্স ও সেল্টিকের মধ্যে এই বিরোধ। বিক্ষোভ ধর্মকে কেন্দ্র করে। সেল্টিক হচ্ছে ক্যাথলিক ও রেঞ্জার্স হচ্ছে প্রটেস্ট্যান্ট।

পূর্ব জার্মানির পরাজয় যেমন অপ্রত্যাশিত, ঠিক তেমন বিস্ময়কর ব্যাপার সুইডেনের মূল প্রতিযোগিতায় সুযোগ লাভ। বিশ্ব-ফুটবলের আসরে সুইডেনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ১৯৫৮ সালে, স্বদেশের মাটিতে, যে বছর ব্রাজিল সুইডেনকে ৫—২ গোলে হারিয়ে দিয়ে সর্বপ্রথম জুলে রিমে কাপ জয় করে। গ্রুপ লীগের খেলায় নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ডের মত দুর্বল প্রতিপক্ষ থাকায় সুইডেনের পক্ষে মূল প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ মিলেছে। তবু বলব যে, তাও মিলেছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর। সুইডেন ও নরওয়ের খেলায় উভয় দলই একটি করে খেলায় জয়লাভ করে। নরওয়ের বিরুদ্ধে সুইডেন জিতেছিল ২—০ গোলে। কিন্তু ফিরতি খেলায় নরওয়ের কাছে হারে ১—২ গোলে। নরওয়ে সুইজারল্যান্ডের কাছে একটি খেলায় জেতে ও একটিতে হারে। আর সুইডেন সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটি খেলাই জেতে ২—১ গোলে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াধারার বিচারে সুইডেনের বর্তমানে অবস্থান ৩০তম স্থানে। সুইডেনকে নক আউটের খেলায় স্থান লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ব্রাজিল, অস্ট্রিয়া ও স্পেনের সংগে। ১৯৭৪ সালেও সুইডেন কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল।

ব্রাজিল • উরুগুয়ে • আর্জেণ্টিনা চিলি • পেরু • মেক্সিকো

পুষ্পেন সরকার

সাম্বা! সাম্বা!

উনিশশো সত্তরের ২১ জুন দুপুরে মেক্সিকো সিটির আজটেক স্টেডিয়ামে উপস্থিত ব্রাজিলিয়ানরা সমস্বরে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল—সাম্বা! সাম্বা! ভ্যাপসা গরমের মধ্যেই তারা তাদের প্রিয় সাম্বা নাচবে! আর নাচবে না-ই বা কেন? আজ তো তাদের নাচেরই দিন। ব্রাজিল ফুটবলের বিশ্বকাপ জিতেছে বলেই নয়। তৃতীয়বার জয়ের ফলে সোনার পরী জুলে রিমে কাপটি চিরদিনের জন্যে পেয়েছে। নাচের দল এগিয়ে চলল মাঠে খেলোয়াড়দের দিকে।

সেদিন ব্রাজিলিয়ানদের উল্লাসের মাত্রাটা বেশি হয়েছিল আরও এই কারণে যে, ফাইনালে যদি প্রতিপক্ষ ইতালি জিতত, তাহলে ইতালিই জুলে রিমে কাপ বরাবরের মত পেয়ে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়ে যেত। কারণ ১৯৭০-এর আগে ইতালিও দু'বার বিশ্বকাপ পেয়েছে। তখন পর্যন্ত দু'বার জুলে রিমে পেয়েছে আরও একটি দেশ—ব্রাজিলের চিরশত্রু উরুগুয়ে। একবার আবার ব্রাজিলকেই হারিয়ে। যে-হারের কথা ব্রাজিলের লোক আজও ভুলতে পারেনি।

ব্রাজিলের ক্যাপ্টেন লুই বেলিনির হাতে জুলে রিমে কাপ

পেলে, সতেরো বছর বয়সে প্রথম যখন বিশ্বকাপে খেলতে নামেন

১৯৭০-এর ঐ ঐতিহাসিক জয়ের পরের বার অবশ্য ব্রাজিল বিশ্বকাপ পায়নি। বস্তুত, পঞ্চাশের দশকের শেষের দিক থেকে সত্তরের দশকের গোড়ার দিকটা পর্যন্তই ব্রাজিলের ফুটবলের স্বর্ণযুগ। ঐ সময়টাকে বিশ্বকাপ-ফুটবলের তথা বিশ্ব-ফুটবলের ইতিহাসে 'ব্রাজিল যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করলে বোধ হয় অতিরঞ্জন হবে না।

ব্রাজিলের ফুটবলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন নিগ্রো খেলোয়াড়রা। অবশ্য কালোদের শত গুণ সত্ত্বেও বহুদিন তাদের প্রতি বিভেদমূলক আচরণ করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য গুণের জোরেই ব্রাজিলের ফুটবলে তাঁরা তাঁদের যোগ্য আসন জয় করে নিয়েছেন। ত্রিশের দশক থেকেই। ১৯৩৮-এর প্রতিযোগিতায় সারা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়ে নেন ব্রাজিলের কৃষ্ণাঙ্গ সেণ্টার ফরোয়ার্ড লিওনিডাস। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল শূন্যে লাফিয়ে "বাইসাইকেল কিক" বা বাইসাইক্লেটা মারতে পারার ক্ষমতা। পেলে, গ্যারিঞ্চা প্রমুখ খেলোয়াড় তাঁর সার্থক উত্তরসাধক।

প্রথম প্রতিযোগিতা থেকেই ব্রাজিল বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশ নিচ্ছে। প্রথমবার অবশ্য ব্রাজিল সেমিফাইনালে যেতে পারেনি পুলের খেলায় যুগোস্লাভিয়ার কাছে পরাজয়ের (১—২) ফলে। অবশ্য বলিভিয়াকে তারা চার গোলে হারিয়ে দেয়। পরের বারও ইতালিতে স্পেনের কাছে ১—৩ গোলে হেরে গিয়ে ব্রাজিল প্রথম রাউণ্ডেই বিদায় নেয়। ১৯৩৮-এ লিওনিডাসের নেতৃত্বে এক অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দল নিয়ে ব্রাজিল ফ্রান্সে যায়। দলে ছিলেন সুদক্ষ ফুল-ব্যাক ডোমিঙ্গাস ডা গুইয়া আর চতুর ফরোয়ার্ড টিম। উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় পোল্যাণ্ডকে ৬—৫ গোলে হারিয়ে ব্রাজিল দ্বিতীয় রাউণ্ডে ওঠে। একদিন ১—১ হবার পর দ্বিতীয় দিনে চেকোস্লোভাকিয়াকে ২—১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে। কিন্তু এক রহস্যময় কারণে লিওনিডাস ও টিমকে ইতালির বিরুদ্ধে নামানো হয় না। ইতালি ২—১ গোলে জিতে ফাইনালে যায়। পরে সুইডেনকে হারিয়ে (৪—২) ব্রাজিল তৃতীয় স্থান পায়।

বারো বছর বাদে ব্রাজিল যখন নিজেই বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পায়, তখন কিছু না পেয়েও ফুটবল-শক্তি হিসেবে তারা স্বীকৃত। ফরোয়ার্ডে ভিতরের তিনজনই—জিজিনহো, অ্যাডেমির এবং জেয়ার—দুর্ধর্ষ বলপ্লেয়ার। প্রত্যাশিতভাবেই ব্রাজিল প্রাথমিক পুলের শীর্ষে যায় অপরাজিত অবস্থায়। ফাইনাল পুলে সুইডেনকে (৭—১) ও স্পেনকে (৬—১) সহজেই হারালেও উরুগুয়ের কাছে হেরে যাওয়ায় ব্রাজিলের দেশের মাটিতে জুলে রিমে কাপ জেতার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। হ্যাঁ, স্বপ্নই দেখেছিল ব্রাজিলের লোক। ভেবেছিল নতুন তৈরি মারাকানা স্টেডিয়ামের আকাশে উড়বে ব্রাজিলের জয়পতাকা। কারণ শীর্ষস্থানের জন্যে একটি পয়েণ্ট দরকার উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলে সেই এক বা দুটিই পয়েণ্ট আসবে। ফ্রিয়াকা-র গোলে এগিয়েও গিয়েছিল ব্রাজিল। কিন্তু উরুগুয়ের অধিনায়ক সেণ্টার-হাফ ভারেলা সেদিন গোটা দলটাকে যেন

কাঁধে করে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর সারা-মাঠ-চষে-বেড়ানো খেলায় অনুপ্রাণিত হয়ে উরুগুয়ে গোল শোধ করে আর-একটি চাপিয়ে দেয় ভারেলাকে মদত দিয়ে যান গোলকীপার মাস-পোলি ও লেফট হাফ আন্দ্রাদে। প্রথমে খুদে রাইট আউট ঘিগিয়ার পাস থেকে লেফট-ইন জুয়ান . সিয়াফিনো ও পরে ঘিগিয়া নিজেই গোল করেন। দু লক্ষ দর্শক দেখলে কীভাবে ব্রাজিলের ইতিহাসে চিরদিনের জন্যে "কালো দিন" হয়ে রইল ১৬ জুলাই। বিশ্বের বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের উপর সবচেয়ে মারাত্মক আঘাতটি হেনে গেল উরুগুয়ে।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল ১৯৫৮-তে। সুইডেনে। ব্রাজিল ফাইনালে সুইডেনকেই হারিয়ে (৫—২) বিশ্ব-কাপ জয়ের স্বাদ পেল। তারা এবার খেলল ৪—২—৪ পদ্ধতিতে। ব্রাজিলের গ্যারিঞ্চার খেলা সারা পৃথিবীর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এই অত্যাশ্চর্য দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়টির একটি পা জন্ম থেকেই এমন বিকৃত ছিল যে, শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করতে হয়। তা সত্ত্বেও একটু বাঁকাই থেকে যায়। 'গ্যারিঞ্চা' শব্দটির মানে ছোট্ট পাখি। সার্থক নাম বটে। নীল আকাশের বুকে ডানা মেলে পাখি যেমন অবাধে উড়ে যায়, মাঠে গ্যারিঞ্চাও সেইরকম অনায়াসে এগিয়ে বিপক্ষ-রক্ষণভাগে ফাটল ধরাতেন। আর ১৯৫৮র প্রতি-যোগিতাতেই বিশ্বফুটবল-মঞ্চে প্রবেশ করলেন ফুটবলের সর্বকালের মহানায়ক পেলে। তখন তাঁর বয়েস মাত্র সতের বছর।

১৯৬২-তে চিলিতে দ্বিতীয় খেলাতেই পেলের পায়ের পেশীতে টান ধরায় তিনি আর খেলতে পারলেন না। ব্রাজিলকে অন্যরকম চিন্তা করতে হল। পাল্টাতে হল খেলার পদ্ধতি। ৪—২—৪ এর বদলে এল ৪—৩—৩। ফরোয়ার্ডে পেলের জায়-গায় খেললেন আমারিল্ডো। ফাইনালে ব্রাজিলের যে দল চেকো-স্লোভাকিয়াকে (৩—১) হারায় তাতে ১৯৫৮র বিজয়ী দলের খেলোয়াড় ছিলেন এক, দুই বা তিন জন নয়—আট জন। নতুন ছিলেন শুধু আমারিল্ডো আর দুজন স্টপার ব্যাক—মাউরো ও জোজিমো। আর একটা লক্ষণীয় ব্যাপার, ১৯৫৮র মত ১৯৬২র ফাইনালেও ব্রাজিলই প্রথমে গোল খায়।

পরের বার ইংল্যান্ডে কিন্তু ব্রাজিলের পুরনো চাল ভাতে বাড়েনি। বুলগারিয়াকে হারালেও হাঙ্গারির (১—৩) ও পর্তু-গালের (১—৩) বিরুদ্ধে হেরে গিয়ে ব্রাজিল পুলে তৃতীয় হয়, কোয়ার্টার-ফাইনালে যাওয়া আর হল না। অবশ্য ফুটবল সম্রাট পেলের সাহায্য ব্রাজিল ঐ বার পায়নি, প্রায় বলেকয়েই তাঁকে মেরে বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে ১৯৭০-এ মেক্সিকোয় পেলে আবার খেলেন। ইতালির বিরুদ্ধে (৪—১) নিজে একটি দেখবার মত গোল করা ছাড়াও সতীর্থদের দিয়ে দুটি গোল করান। বিশ্বকাপ-ফুটবলে ঐটিই পেলের শেষ খেলা।

ব্রাজিলই একমাত্র দেশ, এ-যাবৎ যে কিনা প্রত্যেকটি বিশ্ব-কাপ প্রতিযোগিতায় ফাইনাল রাউণ্ডে খেলেছে। ব্রাজিলের মত বেশিবার কেউ ফাইনালে ওঠেনি বা বিশ্বকাপ পায়নি। আর ফাইনালে এ-পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গোলের ব্যবধানে জয়ের কৃতিত্বও ব্রাজিলেরই।

কেবল একটি আশা ব্রাজিলের এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে। শুধু যদি একবার ফাইনালে উরুগুয়েকে হারানো যায়!

যে-সব অর্থে ব্রাজিল বিশ্ব-ফুটবলে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সেই সব দিক থেকে না পারলেও উরুগুয়ে একটি রেকর্ড করেছে। আর-কোনও দেশ সেটা পারেনি। এমন কী ব্রাজিলও নয়। উরুগুয়েই একমাত্র দেশ যারা বিশ্বকাপে এবং অলিম্পিকে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রতিক্ষেত্রেই দু'বার। বিশ্বকাপ পাবার আগেই উরুগুয়ে পরপর দু'বার অলিম্পিকে ফুটবলে সোনা পায়।

একমাত্র গাছগাছড়ার ভেষজগুণ দাঁতকে ক্ষয় থেকে বাঁচাতে পারে

এক মাত্র নিম

টুথপেস্টেই আছে নিমগাছের

যাবতীয় ভেষজ ও ঔষধীয় গুণ

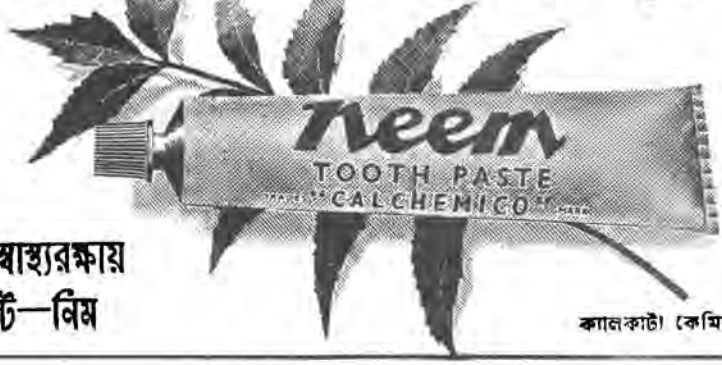

IDL/NTN/48

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্যরক্ষায়
অদ্বিতীয় টুথপেস্ট—নিম

ক্যালকাটা কেমিকাল এর তৈরি

১৯৩০ সালে যোগদানকারী দেশের সংখ্যা কম থাকায় প্রত্যেক গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দল সোজা সেমিফাইনালে গিয়েছিল। পেরু (১-০) ও রুমানিয়ার (৪-০) বিরুদ্ধে খেলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে যুগোস্লাভিয়াকে ৬-১ ও ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ৪-২ গোলে হারিয়ে সোনার পরীতে প্রথম নামটি খোদাই করে উরুগুয়ে।

এই হল উরুগুয়ে। ফুটবল যেন এখানকার লোকের রক্তে মিশে আছে। উরুগুয়েবাসীর কথা হল, ফুটবলে ফাঁকি চলে না। নিয়মানুবর্তী না হলে কি বাজে খেললে ক্ষমা নেই। ১৯৫০-এর কাপ-জয়ী দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় মিথিয়াস গঞ্জালেসের উপর ছুরি চালিয়েই দিল উরুগুয়েনরা! অপরাধ? প্রধানত তাঁর দোষেই ব্রাজিল প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে হেরে গেছে। বেচারা ১৯৫৪-তে সুইজারল্যান্ডে যেতেই পারলেন না! সুইজারল্যান্ডে উরুগুয়ে সেমিফাইনালে দুর্ধর্ষ হাঙ্গারির বিরুদ্ধে হারলেও (২—৪) কোয়ার্টার ফাইনালে স্ট্যানলি ম্যাথুজ, বিলি রাইট, লফটহাউস, ফিনে ইত্যাদি তারকাখচিত ইংল্যান্ডকে (৪—২) এবং গ্রুপ লীগে চেকোস্লাভাকিয়া (২—০) ও স্কটল্যান্ডকে (৭—০) হারিয়ে দিয়েছিল। ১৯৬২-তে গ্রুপ লীগে তৃতীয় হওয়ায় কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে পারেনি। আর পরের বার যদিও গ্রুপ লীগে দ্বিতীয় হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে যায়, সেখানে পশ্চিম জার্মানির কাছে ০—৪ গোলে হার হয়। সে এক মারপিটের খেলা। বিশ্বকাপের একটি 'যুদ্ধ'। দুজন খেলোয়াড়কে রেফারি বার করে দেওয়ার উরুগুয়ে দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় পুরোটাই ন'জনে খেলেছিল। ১৯৭০-এ চতুর্থ স্থান পেয়ে উরুগুয়ে আগের গৌরব কিছুটা ফিরে পায়। সেমিফাইনালে হারে ব্রাজিলের কাছে (১—৩) এবং তৃতীয় স্থানের খেলায় পশ্চিম জার্মানির কাছে। অবশ্য কুশলী ইনসাইড পেড্রো রোচা আহত না হলে হয়ত উরুগুয়ে আরও খানিকটা ভাল ফল করত। গতবার চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলেও সেখানে আবার শক্তিশালী হল্যান্ড ও সুইডেনের গ্রুপে পড়ে গিয়ে সর্বনিম্নস্থান পেয়ে বিদায় নেয়। এবার উরুগুয়ে মূল প্রতিযোগিতায় আসতে পারেনি।

বিশ্বকাপ-ফুটবল প্রতিযোগিতার নিয়ম-অনুযায়ী এবার আয়োজনকারী দেশ হিসেবে আর্জেন্টিনা সরাসরি মূল প্রতিযোগিতাতেই খেলার অধিকার পেয়েছে। এক নম্বর গ্রুপে আর্জেন্টিনাকে লীগ খেলতে হবে ইতালি, হাঙ্গারি ও ফ্রান্সের সংগে। গতবার মিউনিখে আর্জেন্টিনা যে-রকম খেলেছে, নিজের দেশে তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারলে ঐ তিনটি দেশের প্রত্যেকের পক্ষেই মাথাব্যথার কারণ হবে আর্জেন্টিনা। গতবার দ্বিতীয় রাউন্ডের গ্রুপ লীগে আর্জেন্টিনা সকলের নীচে ছিল। উপরে যারা ছিল, তারা হল হল্যান্ড, ব্রাজিল ও পূর্ব জার্মানি। দুর্দান্ত নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা হারে ০—২ গোলে। আর প্রথম রাউন্ডের গ্রুপ লীগে প্রতিযোগিতার অন্যতম শক্তিধর দল ইতালিকে তারা সংযত (১—১) করে রেখেছিল।

সাল তারিখ নিয়ে বিচার করলে আর্জেন্টিনার ফুটবল-চর্চা দীর্ঘ দিনের। জাতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা-বৎসর ১৮৯৩। কিন্তু প্রথম দিকে ফুটবল আর্জেন্টিনায় সহজে জনপ্রিয় হতে পারেনি—ইংল্যান্ডের কয়েকটি বিখ্যাত দলের সফর সত্ত্বেও। এই জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করে ইতালীয়রা—আর্জেন্টিনায় বসবাস করতে এসে। লুইসিটো মণ্টি, রেমন্ডো অর্সি, আলফ্রেডো ডি স্তেফানো, রসি, সিভোরি, অ্যাঞ্জেলিলো, লাবরুনা—আর্জেন্টিনার এই ফুটবল-তারকারা সকলেই কোনো-না-কোনো ভাবে ইতালীয়। প্রথম দু'জন আবার ১৯৩৪-এর বিশ্বকাপ জয়ী ইতালি দলের নিয়মিত খেলোয়াড়। আর পরপর পাঁচবার ইউরোপীয়ান কাপ বিজয়ী রিয়েল ম্যাড্রিড-এর বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় ডি স্তেফানো অনেকের মতে সর্বকালের সেরা 'কমপ্লিট ফুটবলার'।

উড়ন্ত 'পাখি' গ্যারিঞ্চা (বাঁয়ে) বল নিয়ে এগোচ্ছেন

আর্জেন্টিনার যে দল প্রথম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় রানার্স হয়, মণ্টি তার অধিনায়ক ছিলেন। সাংঘাতিক মারকুটে! তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ করে ঘুষি বা লাথি না খেয়ে কোনও বিপক্ষ খেলোয়াড় ফিরে আসতে পারলে সেটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার হত। কিন্তু মণ্টি ও তাঁর মত দু'চার জন খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও আর্জেন্টিনার লোকেরা বলপ্রয়োগে উত্তপ্ত ফুটবল মোটেই পছন্দ করত না, তারা চাইত ফুটবলের কারুকার্য ও শিল্পসুষমা। সেইরকম খেলা খেলেই বহুদিন আর্জেন্টিনা দেশে-বিদেশে প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু এক সময় আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা আত্মবিস্মৃত হয়ে মারপিটের খেলাই আবার আরম্ভ করলেন। ১৯৫৮-তে সুইডেনে চেকোস্লোভাকিয়ার কাছে শোচনীয় (১—৬) পরাজয়ের পর যখন দল ফিরছিল, তখন ক্রুদ্ধ দেশবাসী বুয়েনস এয়ারেস বিমান-ঘাঁটিতে খেলোয়াড়দের মাথায় জঞ্জাল ঢেলে দেয়। এর ফলেই ঐ পরিবর্তন। কিন্তু তা শুভ হয়নি। ১৯৬৬-তে ওয়েম্বলি-তে কোয়ার্টার-ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঐ খেলা খেলতে গিয়ে আর্জেন্টিনা শুধু হেরেই (০—১) যায়নি, চুয়ান্ন মিনিট তাদের দশজন নিয়ে খেলতে হয়েছিল। দীর্ঘদেহী অধিনায়ক অ্যানটনিও র‍্যাটিনকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল রেফারির

প্রথমবার (১৯৩০) বিশ্বকাপ-জয়ী উরুগুয়ের উল্লাস

আদেশে। তা না হলে, ঠান্ডা মাথায় পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেললে আর্টাইম, ওনেগা ও র‍্যাটিনের মত খেলোয়াড় নিয়ে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দেবার ক্ষমতা তাদের ছিল। রানার্স হওয়ার বেশি বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় আর্জেন্টিনা আর কিছু করতে পারেনি।

আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের দেশ চিলি বিশ্ব-ফুটবলে তেমন কোনও বড় রকমের বিস্ফোরণ ঘটাতে পারেনি। প্রথম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় দুটি খেলায় মেক্সিকোর (৩—০) ও ফ্রান্সের (১—০) বিরুদ্ধে জিতলেও আর্জেন্টিনার কাছে হেরে যাওয়ায় সেমি-ফাইনালে যেতে পারেনি। চিলিকে আবার চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখা যায় বিশ বছর পরে ব্রাজিলে। কিন্তু সেখানে ইংল্যান্ডজয়ী আমেরিকাকে হারালেও ইংল্যান্ডের (০—২) ও স্পেনের (০—২) কাছে হারের ফলে তৃতীয় হয়। ১৯৬২-তে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল চিলিতেই। সেবার চিলি তৃতীয় স্থান পায়। এ-পর্যন্ত বিশ্বকাপে ঐটাই চিলির সবচেয়ে ভাল ফল। ঐবার সুইজারল্যান্ডের (৩—১) ও ইতালির (২—০) বিরুদ্ধে জিতে এবং পশ্চিম জার্মানির কাছে (০—২) হেরে গ্রুপে দ্বিতীয় হয়। কোয়ার্টার ফাইনালে ইয়াসিন, অস্ট্রোভস্কি, ভরোনিন, নেটো আইভানভের রাশিয়াকে হারিয়ে দেয়। চিলির লেফট হাফ রোজাস, রাইট-ইন টোরো ও লেফট আউট টোরো এই খেলায় অসাধারণ ভাল খেলেন। কিন্তু সেমিফাইনালে সেবারের বিজয়ী ব্রাজিলের বিরুদ্ধে জোর লড়াই করেও (২—৪) হেরে যায়। তৃতীয় স্থানের খেলায় রোজাসের গোলে যুগোস্লাভিয়াকে হারায়। ইংল্যান্ডে কিন্তু চিলি মোটেই ভাল খেলতে পারেনি। রাশিয়া (১—২) ইতালি (০—২) ও উত্তর কোরিয়ার (১—১) সঙ্গে খেলে গ্রুপে সবচেয়ে নীচে থাকে। ১৯৭০-এ প্রাথমিক পর্যায়ের গন্ডি পার হতে পারেনি। অবশ্য সেখানে উরুগুয়ের সঙ্গে একটি খেলা ড্র হয়েছিল। গতবার প্রাথমিক পর্যায়ে রাজনৈতিক কারণে রাশিয়া চিলির বিরুদ্ধে ফিরতি খেলায় খেলতে রাজি না-হওয়ায় ওয়াক-ওভার পেয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে যায়। প্রথম রাউন্ডে গ্রুপ লীগে শক্তিশালী পশ্চিম জার্মানির কাছে মাত্র এক গোলে হারলে এবং পূর্ব জার্মানি (১—১) ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে (০—০) ড্র করলে গ্রুপে তৃতীয় হয়ে বিদায় নিতে হয়।

এবার প্রাথমিক লীগে চিলি পেরু ও ইকোয়েডরের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবে পেরু। প্রথম বিশ্বকাপে পেরুর প্রথম খেলার স্মৃতি মোটেই সুখকর নয়। এক দুঃস্বপ্ন। রুমানিয়ার সঙ্গে এক মারদাঙ্গার খেলায় ১—৩ গোলে হারে। বেরিয়ে যেতে হয় অধিনায়ককে। দ্বিতীয় খেলায় উদ্যোক্তা উরুগুয়ের কাছে একটিমাত্র গোলে হারে। ছ'বছর বাদে বার্লিনে অলিম্পিকে ভাল খেলে তারা সেমিফাইনালে পৌঁছয়, কিন্তু অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বদলি খেলোয়াড় নামানোর জন্যে জেতা (৪—২) সত্ত্বেও আবার খেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। পেরু খেলতে রাজি না হওয়ায় ওয়াকওভার পেয়ে অস্ট্রিয়া ফাইনালে যায়। এর পর বহুদিন পর্যন্ত কি বিশ্বকাপে কি অলিম্পিকে পেরু চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে পারেনি। অন্যতম প্রধান কারণ হল বেশি টাকা ও যশের প্রলোভনে ভাল খেলোয়াড়রা বিদেশে চলে যান। এসব সত্ত্বেও প্রথম হাঙ্গারির অর্থ ও পরে ব্রাজিলের ডিডির প্রশিক্ষণ পেয়ে ১৯৭০-এ চমৎকার আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে যায়। কোয়ার্টার ফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ২—৪ গোলে হারে। প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি পান পেরুর তিওফিলো কুবিল্লাস।

মেক্সিকো রুপোর দেশ—পৃথিবীর অর্ধেক রুপো এখানেই পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্বল মেক্সিকোর ফুটবলের আকাশে রুপোলি রেখা ঝিলিক দেয়নি। প্রথমবার মেক্সিকো পুলের তিনটি খেলাতে ফ্রান্সের (১—৪), চিলির (০—৩) ও আর্জেন্টিনার (৩—৬) বিরুদ্ধে হেয়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মেক্সিকোর ফুটবলে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের প্রভাব প্রবল হয়ে দেখা দেয়। বড় বড় টীমে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা খেলতে থাকেন। কিন্তু ষাটের দশকে ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের আকর্ষণ প্রবলতর হয়। ১৯৩০-এর আগে ও পরে অলিম্পিক ফুটবলে যোগ দিলেও ১৯৫০-এর আগে বিশ্বকাপে মেক্সিকোকে আর দেখা যায়নি। ব্রাজিলের (০—৪), যুগোস্লাভিয়ার (১—৪) ও সুইজারল্যান্ডের (১—২) বিরুদ্ধে হেরে পুলে সকলের নীচে থাকে। ১৯৭৪ পর্যন্ত বিশ্বকাপে নিয়মিত অংশ নিলেও উল্লেখযোগ্য ফল করতে পারেনি। সুইজারল্যান্ড ব্রাজিলের (০—৫) ও ফ্রান্সের (২—৩) বিরুদ্ধে হেরে পুল লীগে সবচেয়ে নীচে। পরের বারে ওয়েলস-এর সঙ্গে ড্র করে বিশ্বকাপে প্রথম পয়েন্ট সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু সুইডেনের (০—৩) ও হাঙ্গারির (০—৪) বিরুদ্ধে হারতে হয়। এবং তার পরের বার চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে ৩—১ গোলে জয়লাভটাই বিশ্বকাপে মেক্সিকোর প্রথম জয়। সেবার দুর্ধর্ষ ব্রাজিলের কাছে তাদের হার মাত্র ০—২ গোলে, আর স্পেনের বিরুদ্ধে ফল ০—১। ১৯৬৬-তে রক্ষণাত্মক খেলা খেলে ফ্রান্স (১—১) ও উরুগুয়ের সঙ্গে (০—০) ড্র করে, কিন্তু ইংল্যান্ডের কাছে ০—১ গোলে, হেরে যায়। সেন্টার-ফরোয়ার্ড বর্জা সকলের প্রশংসা পান। ১৯৭০-এ প্রতিযোগিতার আয়োজনকারী মেক্সিকো এক নম্বর গ্রুপে রাশিয়া (০—০) বেলজিয়াম (১—০) ও এল সালভাডরের বিরুদ্ধে খেলে সর্বপ্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে আসে, কিন্তু রিভা, রিভেরা ও ফ্যাচেত্তির ইতালি তাদের সহজেই হারিয়ে (৪—১) দেয়। গতবার মেক্সিকো মূল প্রতিযোগিতায় যেতে পারেনি। এ-বছর মেক্সিকো আবার ফাইনাল পর্যায়ে এসেছে।

বিশ্বকাপ ফুটবল / পশ্চাৎপট

ইতালি • পর্তুগাল • ফ্রান্স • স্পেন • হল্যাণ্ড

চিরঞ্জীব

ইতালি, পর্তুগাল, ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ড, বিশ্বকাপ-ফুটবলের ইতিহাসে এই পাঁচটি দেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। তবে আর্জেন্টিনায় এবারের চূড়ান্ত পর্বের খেলায় শেষ ষোলটি দেশের মধ্যে পর্তুগাল নেই। ফাইনাল রাউণ্ডে খেলার জন্য এবার তারা যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তা হলেও বিশ্বকাপ-ফুটবলে তার কৃতিত্ব কম নয়।

যে পাঁচটি দেশের কথা বলছি, তাদের মধ্যে বিশ্বকাপে সবার আগে অংশ নিয়েছে ফ্রান্স। কিন্তু সবচাইতে কৃতিত্ব ইতালির। ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে পর পর দুবার তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ১৯৭০-এ তারা মেক্সিকো বিশ্বকাপে ছিল রানার্স। রানার্স হয়েছিল ১৯৭৪-এ পশ্চিম জার্মানিতে হল্যাণ্ড।

১৯৩০-এ বিশ্বকাপের শুরুতেই ফ্রান্সের অংশ নেওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। ফুটবলের ওয়ার্ল্ডকাপের চিন্তা সব্বার আগে আসে দুজন ফরাসীর মাথায়। ওঁরা জুলে রিমে ও হেনরি ডেলান। ১৯২০ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত রিমে সাহেব ছিলেন ফিফা-র (ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনালে দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) সভাপতি। এবং সম্পাদক ডেলান সাহেব ১৯১৯ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত। অনেক তর্কের পর স্থির হয়, প্রথম বিশ্বকাপ হবে উরুগুয়েতে। তবুও আরও কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের মত ইতালি, স্পেন ও হল্যাণ্ড জানিয়ে দেয় তারা খেলবে না। সেবার ১৩টি দেশ অংশ নেয় এবং খেলা হয় চারটি পুল করে। এক নম্বর পুলে ফ্রান্স ৪—১ জিতেছিল শুধু মেক্সিকোর বিরুদ্ধে। হারে আর্জেন্টিনা ও চিলির কাছে একইভাবে ০—১ গোলে। নিজ পুলের লীগ টেবলে স্থান হল তৃতীয় চারটি দলের মধ্যে।

শুরুর বছরে ইতালি বয়কট করলেও পরের বার অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া হল তাদের। মুসোলিনি তখন ইতালির সর্বেসর্বা। তিনি নির্দেশ দিলেন, বিশ্বকাপের আয়োজনে যেন ত্রুটি না থাকে। বললেন : ইতালিতে খেলা হচ্ছে, আমরা যদি চ্যাম্পিয়ন হই, তবে সারা দেশের মানুষ শুভেচ্ছা জানাবে। মুসোলিনি শুধু নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁর ফুটবলাররা কেমন অনুশীলন করছে, কীভাবে তৈরি হচ্ছে—এসব দেখতে চলে যেতেন হঠাৎ-হঠাৎ। আজ ইতালিতে অসংখ্য ক্লাব, এবং তাদের মধ্যে ইন্টার ও জুভেন্টাস সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী। আমাদের যেমন মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল, তেমনি সেকালে ইতালিরও ছিল ওই দুটি দল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্টার ও জুভেন্টাসের খেলোয়াড়দের একত্র করে গড়া হল জাতীয় দল। খেলতে এল ফ্রান্স ও স্পেন। ফ্রান্স এবারও ভাল ফল দেখাতে পারেনি। প্রথম রাউণ্ডে ২—৩ গোলে হারে অস্ট্রিয়ার কাছে। আর স্পেন প্রথম রাউণ্ডে ৩—১ গোলে ব্রাজিলকে হারাল। দ্বিতীয় রাউণ্ডে তারা ইতালিকে ভীষণ বেগ দিল। ১—১ ড্র করল। তবে রিপ্লেতে ইতালির মিজ্জার গোলে স্পেন হারে। ইতালি প্রথম রাউণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়েছিল ৭—১ গোলে। সেমি ফাইনালে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জেতে (১—০) গাইতার গোলে। ফাইনালে তারা মুখোমুখি হল চেকোস্লোভাকিয়ার। খেলা পড়ল রোমে। মুসোলিনি সহ ৫৫ হাজার দর্শকের সামনে খেলা। এর মধ্যে চেক রাজধানী প্রাগ থেকে আসেন দুটি বিশেষ ট্রেন ও তিনটি মোটর কোচ ভর্তি লোক। বিরতির সময় ছিল ০—০। তারপর চেকরা এগোয় ১—০, তাদের লেফট আউট পাক-এর গোলে। ওরসি করলেন ১—১। নির্দিষ্ট সময়ে ফয়সালা না হওয়ায় অতিরিক্ত সময়ে শিয়াভিও-র গোলে ইতালি বিশ্বকাপ তো জিতলই, তাদের লাভ হল ১০ লক্ষ লিরা। কিন্তু খেলার শেষে সেকালের সমালোচক ও সাংবাদিকরা সন্দেহ প্রকাশ করে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, বিশ্বকাপের খেলা ইতালিতে না হয়ে অন্য দেশে হলে কি তারা ট্রফি পেত?

চার বছর পর ১৯৩৮-এ বিশ্বকাপের আসর বসল ফ্রান্সে। স্পেন এবার আর এল না। তবে হল্যাণ্ডের দেখা মিলল। এল ইতালি। আর ফ্রান্স তো আছেই।

এই চার বছরে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি দলে অনেক রদবদল হয়েছে। ১৯৩৪-এর দলে থাকলেন শুধু মিজ্জা ও ফেরারি। দলের বাকি সকলে নতুন। কিন্তু সেকালে অমন কুশলী ফুটবলার কারুর ছিল না। যে পোজো ১৯৩৪-এর দল গড়ার মূলে ছিলেন, তিনি বললেন, ফ্রান্সগামী ইতালি দল গতবারের চাইতে শক্তিশালী এবং সংহত। উনি সবচেয়ে আশাবাদী ছিলেন সেণ্টার ফরোয়ার্ড

ইতালি-হাঙ্গারির ফাইনাল (১৯৩৮)। ইতালির রাজা হেড করছেন

শিশুদের– কিশোরদের– যত ছোটদের বই

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫·০০
এক ডজন গপ্‌পো ১০·০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা·৫·০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০০
সোনার কেল্লা ৬·০০
বাক্স-রহস্য ৫·০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫·০০
সাবাস.প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫·০০
আরো এক ডজন ১০·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০
ফটিকচাঁদ ৮·০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৮·০০
মহাসংকটে শঙ্কু ৬·০০

শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪·০০
শিব্রামের বারো আড়ি ৫·০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৫·০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬·০০

বিমল কর
ওআণ্ডার মামা ৬·০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭·০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীত রাতের আহ্বান ৩·০০

গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩·০০

আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫·০০

পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪·০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৩·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭·০০

শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০
বাজনা ৫·০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০
আমার নাম টায়রা ৫·০০

বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫·০০
ঝাঁকিদর্শন ৬·০০

সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০·০০
জীবজন্তু ৮·০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০

সরলাবালা সরকার
পিন্‌কুর ডাইরি ৩·০০

মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শুধু 'ঘনাদা'র গল্প শুনিয়েই বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। বল্‌গাহীন কৌতুক-কল্পনার রাজা 'ঘনাদা'—সারা বাংলা সাহিত্যে তাঁর আর জুড়ি নেই। তাঁর কীর্তি-কাহিনীগুলি যতবারই পড়া হোক না কেন, কখনও যেন পুরনো হয় না। প্রতিবারই মনে হয় নতুন। মনে হয় সমান বর্ণোজ্জ্বল, সমান আকর্ষক। সেই রকম চিরনতুন কয়েকটি কাহিনীর সংকলন ঃ

আগ্রা যখন টলমল ৫.০০

যাঁর নাম ঘনাদা ৫.০০

পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫·০০
পাপুর বই ৬·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫·০০
পাথরের চোখ ৬·০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪·০০

ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৫·০০
সত্যি রাজপুত্র ৫·০০
তিন নম্বর চোখ ৫·০০
হলদে বাড়ির রহস্য ও
দিনে ডাকাতি ৬·০০

মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪·০০
স্ট্রাইকার ৬·০০
স্টপার ১০·০০
কোনি ৬·০০

সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০

নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ কৃস্ট্যাল ১০·০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪·০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক ৪·০০

লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪·০০

অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০·০০

আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০

সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫·০০

অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩·০০

ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪·০০

গিরিধারী কুণ্ডু
টংসা চু ৫·০০

সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫·০০

বিমল মিত্র
রাজা হওয়া ঝকমারি ৭·০০

শিশিরকুমার মজুমদার
তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫·০০

অন্নদাশংকর রায়
হৈ রে বাকই হৈ ৫·০০

মঞ্জিল সেন
ডাকাবুকো ৫·০০

রেবন্ত গোস্বামী
অরুমিতুদের কথা ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

প্রো ভর্সেলি ক্লাবের সিলভিও পিওলা সম্পর্কে। ইতালি প্যারিস পেঁছিল দুর্ভেদ্য গোলরক্ষক আলদো ওলিভেরি ও দুই ব্যাক ফনি ও রাভাকে নিয়ে। শেষের দুজন জুভেন্টাসের। উভয়েই ১৯৩৬-এর অলিম্পিক সোনা-জয়ী দলে খেলেন। বলা বাহুল্য ইতালিই ছিল ফেভারিট। তাই গতবার যাঁরা ইতালির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সন্দেহ করেছিলেন, এবার তাঁদেরই কেউ কেউ বললেন, আমরা ভুল করেছিলাম।

নবাগত হল্যান্ড প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নেয় চেকোস্লোভাকিয়ার কাছে ০—৩ হেরে। ফ্রান্স দ্বিতীয় রাউন্ডে পেঁছয় ৩—১-এ বেলজিয়ামকে হারিয়ে। ফেভারিট ইতালি কিন্তু প্রথম রাউন্ডে দর্শকদের টানতে পারেনি। নরওয়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে খেলার মীমাংসা (১—১) হয়নি। অতিরিক্ত সময়ে পিওলার গোলে তারা ২—১ জেতে। দ্বিতীয় রাউন্ডে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালির সামনে পড়ল উদ্যোক্তা ফ্রান্স। বিরতির আগে পর্যন্ত ফ্রান্স দারুণ লড়ে ১—১ করে। কিন্তু ইতালির ব্যাক সেরান্তোনির রোবাস্ট ফুটবলের কাছে ফ্রান্স প্রতিহত হতে থাকে বারেবারে। কলোসি ও পিওলার (২) গোলে ৩—১ গোলে জিতল ইতালি। সেমিফাইনালে ইতালির বিরুদ্ধে ছিল ব্রাজিল। বিরতির আগে ইতালি কলোসি ও মিজ্জার গোলে (শেষেরটি পেনাল্টি) ২—০ এগিয়ে থাকে। বিরতির পরে ব্রাজিলের রোমিও একটি গোল শোধ করেন।

১৯ জুন প্যারিসের কলম্বাস স্টেডিয়ামে ফাইনাল হাঙ্গারির সঙ্গে। ওরাও ভীষণ শক্তিশালী। তবে ফাইনালে অধিনায়ক সারোশি ও লেফট-ইন সেঙ্গেলার আশানুরূপ খেলতে পারেননি। শুরুর ছয় মিনিটের মধ্যেই মুসোলিনির দেশ যেন বোমাবর্ষণ আরম্ভ করল হাঙ্গারির উপরে। বিভাটির কাছ থেকে বল পেয়ে কলোসি ১—০ এগিয়ে দিলেন ইতালিকে। কিন্তু পরবর্তী মিনিটে টিটকস ১—১ করে দেন। ১৫ মিনিট না কাটতেই পিওলা ২—১ এগিয়ে দেন ইতালিকে। বিরতির দশ মিনিট আগে কলোসি আরও একটি গোলে ৩—১ করলেন। বিরতির পর বেশ কিছুক্ষণ সমানে সংগ্রাম। সারোশি চমৎকার শটে ব্যবধান কমালেন ৩—২ শেষ বাঁশির দশ মিনিট আগে পিওলা আবার গোল দিলেন ৪—২।

বিশ্বকাপ পরপর দুবার জিতল ইতালি। আনন্দে সকলে কাঁদছেন ড্রেসিং রুমে ফিরে। সবচেয়ে খুশি পোজো—যিনি চার বছর আগে দেশের বিবদমান ক্লাবগুলির মধ্যে মিলন এনেছিলেন।

চার বছর পরে-পরে বিশ্বকাপের খেলা হওয়ার কথা। কিন্তু ১৯৪২ ও ১৯৪৬-এ হল না। যুদ্ধের জন্য প্রতিযোগিতা স্থগিত রইল। তবে ফুটবলের জোয়ার এসে গেছে তখন দেশে-দেশে। কিন্তু দেখা গেল না ফ্রান্স ও হল্যান্ডকে। পর্তুগাল তখনও বিশ্বকাপে নাম লেখায়নি। দুই নম্বর পুলে খেলে সব কটি ম্যাচে জিতে পুল-শীর্ষে স্থান পেল। তার দিকে আর ছিল ইংল্যান্ড, চিলি ও যুক্তরাষ্ট্র। তিন নম্বর পুলে ইতালির সঙ্গে ছিল সুইডেন ও প্যারাগুয়ে। ইতালি জিতেছিল শুধু প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে। সুইডেনের কছে হারে ২—৩ গোলে। দুইবারের চ্যাম্পিয়ন সেই পুরনো দলে না থাকাই স্বাভাবিক ১২ বছর পরে। কিন্তু এমন হবে কেন? ১৯৫০-এর বিশ্বকাপে ওদের সব আশা শেষ হয়ে যায় ১৯৫৯-এর মে মাসে সুপারগা বিমান দুর্ঘটনায়, ইতালির সেরাদের নিয়ে গড়া তোরিনো দল লিসবন থেকে ফিরছিল খেলে। পাহাড়ের গায়ে বিমানটি ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যায়। সকলেই নিহত হন। তোরিনো ক্লাবে ছিলেন ইতালির জাতীয় দলের সেরা আটজন। ছিলেন তৎকালীন ইউরোপের সেরা লেফট ইন ও ইতালির অধিনায়ক ভ্যালেন্তিনা মাজোলা ও সেরা ব্যাক মারোসা।

ফাইনাল পুলে খেলার যোগ্যতা পেল স্পেন, ব্রাজিল, সুইডেন ও উরুগুয়ে। কিন্তু লীগ প্রথায় দুটি ম্যাচেই স্পেন হেরে সর্বনিম্ন স্থান পেল। তারা শুধু প্রথম ম্যাচে উরুগুয়ের সঙ্গে ২—২ করতে পেরেছিল।

বুলগারিয়াকে গোল দিচ্ছেন পর্তুগালের ইউসেবিও (১৯৬৬)

ডি স্টিফানো তাঁর বল-কন্ট্রোলের কৌশল দেখাচ্ছেন

১৯৫৪ সালে সুইজারল্যানড-বিশ্বকাপে হাজির শুধু ফ্রান্স আর ইতালি। ফ্রান্স লীগের পুল ১-এর ম্যাচে প্রথম খেলায় ০—১ হারে যুগোস্লাভিয়ার কাছে, আর জেতে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ৩—২। কিন্তু পুলে তৃতীয় স্থান পাওয়ায় কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে পারেনি। পুল-৪-এ ইতালি ও সুইজারল্যান্ডের সমান পয়েন্ট (২) হয় ১টি করে জেতায়। কিন্তু প্লে অফ ম্যাচে সুইজারল্যান্ডের কাছে ১—৪ হারে।

সুইডেনে ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে এল শুধু ফ্রান্স। তারা এবার দারুণ শক্তিশালী, সেন্টার ফরোয়ার্ডে জাস্টো ফনটাইন বিস্ময়কর ফুটবল খেললেন। বিশ্বকাপে সেবার তাঁর দেওয়া ১৩টি গোল আজও রেকর্ড হয়ে আছে। ফ্রান্স শুধু তৃতীয় স্থান পেল না, বিশ্ব ফুটবলে তারা নগণ্য নয়, একথা প্রমাণ করে। লীগের খেলায় পুল-২-তে তারা শীর্ষে ছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে ৪—৩ হারায় আয়ারল্যান্ডকে কিন্তু সেমিফাইনালে ২—৪ হারে ব্রাজিলের কাছে। ব্রাজিল দলে তখন গ্যারিঞ্চা, ডিডি, ভাভা, পেলে, জাগালো প্রভৃতি। তাই ফনটাইন, কোপা, পিয়ানটোনিদের করার কিছুই ছিল না। তবে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় ফ্রান্স ৬—৩ গোলে হারায় পশ্চিম জার্মানিকে। ফনটাইন একাই ৪টি গোল দিয়েছিলেন।

বিজয়ী ইতালি (১৯৩৮)। ম্যানেজার পোজোর হাতে বিশ্বকাপ

জার্মানির সিলার জোর 'মাথা খাটিয়েছেন'

চার বছর পরে ১৯৬২-র চিলিতে কিন্তু ফ্রান্স এল না। 'ক্যাটেনাসিও' পদ্ধতির ফুটবল নিয়ে এল ইতালি। তারা এসেছিল ইতালির সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইনসাইড ফরোয়ার্ড গিয়ানি রিভেরাকে নিয়ে—১৬ বছর বয়সেই যার দাম ছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার পাউন্ড। কিন্তু ইতালি তাদের গ্রুপে তৃতীয় স্থান পেল পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে ০—০ ও চিলির কাছে ০—২ হেরে। ৩ নম্বর গ্রুপে স্পেন শুধু জিতেছিল মেক্সিকোর বিরুদ্ধে, ১—০।

১৯৬৬-র প্রতিযোগিতায় ফ্রান্স এলেও ১ নম্বর গ্রুপে সর্বনিম্নে স্থান হল, ২ নম্বর গ্রুপে স্পেন হল তৃতীয়, ৩ নম্বর গ্রুপে ইতালিও তাই। কিন্তু ৩ নম্বর গ্রুপে পর্তুগাল থরহরি কম্প লাগাল। হারাল ব্রাজিল, হাঙ্গারি ও বুলগারিয়াকে। বিশ্বকাপে এতদিন দেখা মিলেছিল একজন পেলের। এবার এলেন ওঁরই মত আর একজন। তিনি 'ইওরোপের পেলে'—ইউসেবিও। বেনফিকা দলের এই খেলোয়াড়টির পুরো নাম ইউসেবিও ডা সিলভা ফেরিরা। ইউরোপে নাকি এমন স্ট্রাইকার আজও জন্মায়নি। ১৯৬৬-র বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার (৯টি) পুরস্কার পেলেন এক হাজার পাউন্ড। তাঁকে আখ্যা দেওয়া হল 'ব্ল্যাক প্যান্থার'।

কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগাল যে ৫—৩ গোলে উত্তর কোরিয়াকে হারায়, তারও ৪টি গোল ইউসেবিওর। সেমিফাইনালে পর্তুগাল ২—১ হারে ইংল্যান্ডের কাছে। একটি শোধ করে ইউসেবিও। তৃতীয় স্থানের খেলায় পর্তুগাল ২—১ হারায় রাশিয়াকে। ইউসেবিও এই ম্যাচেও গোল করলেন।

১৯৭০-এ মেক্সিকো-বিশ্বকাপে কিন্তু পর্তুগাল চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে পারেনি। প্রাথমিক পর্যায়ে নিজ গ্রুপে তারা সর্বনিম্নে ছিল ৬টি ম্যাচে ৪ পয়েন্টে। প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত রয়ে গেল ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যান্ড। চূড়ান্ত পর্যায়ে গেল শুধু ইতালি ইউরোপের ৩ নম্বর গ্রুপের শীর্ষে স্থান পেয়ে—৪টি খেলায় ৭ পয়েন্ট অর্জন করে। গ্রুপ শীর্ষে রইল মেক্সিকোয় চূড়ান্ত পর্যায়েও। কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকোকে ৪—১ গোলে হারাল আর সেমিফাইনালে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পশ্চিম জার্মানিকে হারায় ৪—৩ গোলে। ফাইনাল পর্যন্ত যেতে রিভা ও রিভেরার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, তবে সবার উপরে ছিলেন ফ্যাচেত্তি। তাঁকে বলা হত গোল স্কোরিং লেফট ব্যাক, ফাইনালে ব্রাজিলের কাছে ইতালি ১—৪ গোলে হারে, তবে ইতালি দল মেক্সিকো থেকে ফেরার সময় স্বদেশে দারুণ সংবর্ধনা পায়, বীরের সম্মান জানানো হল ওই গিয়াসিন্টো ফ্যাচেত্তিকে।

১৯৬৬-তে পর্তুগাল বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল, ১৯৭০-এ অবাক করে দিল হল্যান্ড। ইতালিও চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছিল পশ্চিম জার্মানিতে খেলতে। পর্তুগাল, স্পেন ও ফ্রান্স প্রাথমিক পর্যায়ে বিদায় নেয় গ্রুপ শীর্ষে স্থান না পেয়ে। ইতালি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলেও প্রথম রাউন্ডে বিদায় নেয় ৪ নম্বর গ্রুপে তৃতীয় স্থান পাওয়ায়। আর হল্যান্ড প্রাথমিক পর্যায় থেকেই 'টোটাল' ফুটবল খেলতে থাকে। তাদের গোলরক্ষক ছাড়া বাকি সকলেই ছিলেন যেন আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়। চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রথম রাউন্ডের লীগেও শীর্ষস্থান পেল ৩টি ম্যাচে ৫ পয়েন্ট অর্জন করে। 'এ' গ্রুপে দ্বিতীয় রাউন্ডে হারাল আর্জেন্টিনাকে ৪—০, পূর্ব জার্মানিকে ২—০, এবং ব্রাজিলকে ২—০ গোলে। অসাধারণ খেললেন নিসকেন্স। কিন্তু যোহান ক্রুইফের মতো ফুটবলার বোধ হয় একালে নেই—বললেন সকলে। 'বি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে ফাইনালে হল্যান্ড হারল ১—২ গোলে। কিন্তু জং ব্লড, সুরবিয়র, হান, রিজ বার্জেন (ডে জং), ক্রল, জানসেন, ভান হালেজেম, নিসকেন্স, রেপ, ক্রুইফ ও রেনসেনব্রিঙ্ক যে ফুটবল দেখালেন, তা কোনদিন ভোলা যাবে না।

প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে পেলে বল নিয়ে বেরোচ্ছেন (১৯৭০)। সেইবারেই ব্রাজিল বরাবরের জন্য জুলে রিমে কাপ জিতে নেয়

কেটে রেখে দিন

বোর্নভিটা আবিষ্কারের আজব কাহিনী-১

টেলিফোনের বিস্ময়কর কথা

আবিষ্কারক ঃ আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল
১৮৪৭-১২৯২ ইউনাইটেড স্টেটস্

সূত্র ঃ বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিবর্ত্তনের-হার-এর ভেতর দিয়ে ধ্বনি পাঠানো

বছর ঃ ১৮৭৬

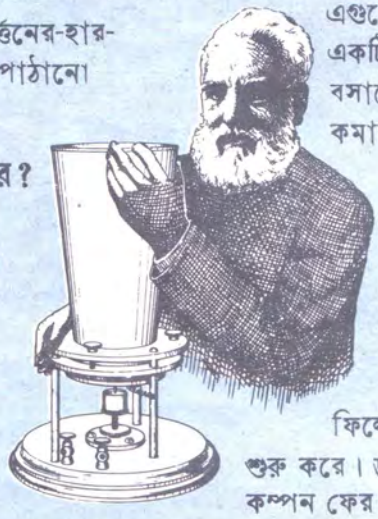

টেলিফোন কি করে কাজ করে?

টেলিফোনের দুটো প্রধান অংশ হোল,-বলার জন্য ট্রান্সমিটার আর শোনার জন্য—রিসিভার। ট্রান্সমিটারে আছে ধাতুর তৈরী একটা পাতলা—চাকৃতি, যা'কে বলা হয় ডায়াফ্র্যাম। এর পেছনে থাকে কারবন-কণা অর্থাৎ গ্র্যানুয়েলস্। গ্র্যানুয়েল বা কণা এক বৈদ্যুতিক-সারকিটেরই অংশ।

কেউ টেলিফোনে কথা বললে, ধ্বনি পরিবর্ত্তনের হারের দরুন ডায়াফ্র্যামটা কাঁপতে থাকে এবং তাতে কারবন-কণাগুলো সংকুচিত হয়ে সারকিটে কমার ও বাড়ার এক বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হয়, যা পরে আরও বড় এবং স্পষ্ট হয়ে তারের ভেতর দিয়ে চ'লে যায়।

রিসিভারে আছে এক ছোট স্থায়ী চুম্বক, যা'র সঙ্গে থাকে সরুতারের কুণ্ডলী (কয়েলস্)। এগুলো খুব পাতলা গোলাকার একটি ধাতুর ডায়ফ্র্যাম ঘেষে বসানো থাকে। যখন, পাঠানো কমার ও বাড়ার বিদ্যুৎ-প্রবাহ, এসব কুণ্ডলী বা কয়েলের ভেতর দিয়ে যায় তখন হ্রাস-বৃদ্ধির (ফ্লাকচুয়েটিং) এক ম্যাগনেটিক ফিল্ড গ'ড়ে ওঠে। ডায়াফ্র্যামাটি ধাতুর তৈরী ব'লে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাকে আকর্ষণ করে এবং ম্যাগনেটিক-ফিল্ডের শক্তি অনুযায়ী তা কাঁপতে শুরু করে। ডায়াফ্র্যামের এসব কম্পন ফের এক ধ্বনি-প্রবাহ সৃষ্টি করে—ঠিক পাঠানো ধ্বনি প্রবাহের অনুরূপ আর শ্রোতা ঠিক তাই শুনতে পান।

ক্যাডবেরিস
বোর্নভিটা
তোমাকে দেয় এগিয়ে থাকার বাড়তি শক্তি

OBM/8976 BEN.

বিশেষ সুযোগ ঃ

এক বিশিষ্ট পরিবেশকের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে আমরা বৃটেনে মুদ্রিত "The How and Why Wonder Book of Communications" (ইংরেজীতে) ৫০ পাতার রঙীন সচিত্র এবং চিত্তাকর্ষক একটি বই আপনাদের মাত্র ৬ টাঃ ৫০ পয়সার সুলভ মূল্যে, (আসল মূল্য ৫০ পেন্স) বিনা ডাক খরচে, যোগানোর ব্যবস্থা করেছি। এই বইটি পাওয়ার জন্য আপনি মানি-অর্ডার দ্বারা ৬ টাঃ ৫০ পয়সা আর পৃথক ডাকে বোর্নভিটার যে কোনো প্যাক থেকে একটি কয়েল বা ওপরের ফ্ল্যাপ পাঠান এই ঠিকানায় ঃ Department : 13 India Book House, 22 Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026 শিগগীর ! বই কিন্তু বেশী নেই।

বিশ্বকাপ ফুটবল / পশ্চাৎপট

সর্বকালের সেরা টীম

সুব্রত সরকার

নয় মিনিটের মাথায় ফ্রান্সের সেন্টার-ফরোয়ার্ড ফনটাইন ব্রাজিলের দ্বিতীয় মিনিটে দেওয়া গোল শোধ করলেন। পাঁচটি ম্যাচে গোলকীপার গিলমার এই প্রথম পরাস্ত। কিন্তু তিনি বা রক্ষণভাগের অন্য কেউ বলটি গোল থেকে বার করবার আগেই ১০ নম্বর জার্সি পরা ছিপছিপে নিগ্রো ছেলেটি উৎফুল্ল ফরাসী প্লেয়ারদের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে নেট থেকে বলটি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে মাঝ-মাঠ অবধি ফিরে সেটি সেন্টার-স্পটে রেখে চেঁচিয়ে উঠল, "চলো! আরম্ভ করা যাক! সময় নষ্ট করে লাভ নেই!"

দশ নম্বর জার্সি পরা ছেলেটির নাম পেলে। তাঁর আত্ম-জীবনীতে সুইডেনে অনুষ্ঠিত ১৯৫৮ সালের ওয়ার্ল্ড কাপের সেমি-ফাইনাল খেলার এই ঘটনার কথা তিনি লিখেছেন। দলের অন্য সবাই তো তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে অবাক! কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বালক পেলের এই দারুণ উৎসাহ তাঁদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। ম্যাচের সপ্তম গোল ফ্রান্স দিলেও ব্রাজিল জেতে ৫—২। তাদের শেষ তিনটি গোলই পেলের।

সেবারই ব্রাজিল প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ জেতে। তবে তাদের সেই ১৯৫৮র বিজয়ী দলই কি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন টীম? একথা সত্যি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের তিনটি বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা তেমন জমেনি—তাই ১৯৩০-৩৪-৩৮-এর বিজয়ী দলগুলিকে সঠিক বিশ্বশ্রেষ্ঠ বলে অনেকেই ধরেন না। উরুগুয়ে ১৯৫০এ জিতেছিল বটে, তবে তাদের আধিপত্য তেমনভাবে নজরে পড়েনি। আবার অধিকাংশ সমালোচকের মতে চুয়ান্নর শ্রেষ্ঠ দল ছিল হাঙ্গারি। কিন্তু সেবার চ্যাম্পিয়ন হয় পশ্চিম জার্মানি। কুড়ি বছর পর পশ্চিম জার্মানি যখন আবার ওয়ার্ল্ড কাপ জেতে, সেবার তারা অপরাজিত ছিল না, গ্রুপের খেলায় পূর্ব জার্মানির কাছে হেরেছিল। আর ১৯৬৬তে দেশের মাটিতে ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হলেও তাদের জয় চোখ-ঝলসানো বলে বিশেষ কেউ মনে করেন না।

বাকি থাকছে ব্রাজিলের ১৯৫৮, ১৯৬২ আর ১৯৭০এর চ্যাম্পিয়ন দলগুলি। তাদের মধ্যে বাষট্টির বিজয়ী টীমে পেলে ছিলেন না, আর চার বছর আগের দলের তুলনায় তাদের খেলা তেমন চমৎকার হয়নি, গতিও ছিল অপেক্ষাকৃত কম। তাই "সর্বশ্রেষ্ঠ" আখ্যা দিতে হয় ১৯৫৮ বা '৭০-এর টীমকে। সত্তরের টীম দারুণ খেলে জুলে রিমে কাপ চিরকালের জন্য ব্রাজিলে নিয়ে যায়, কিন্তু ততদিনে তো ব্রাজিল না জিতলেই লোক অবাক হত। সেই দিক থেকে বিচার করতে গেলে আটান্ন সালের চ্যাম্পিয়ন দল বিশ্ব-ফুটবলে এক নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটায়। সুইডেনেই ব্রাজিল প্রথমবার ওয়ার্ল্ড কাপ জেতে; সেবারই তাদের দারুণ দক্ষ খেলোয়াড়েরা মিলে প্রথম এক দুর্ধর্ষ টীমে পরিণত হয় সেবারই পেলে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথম

(শেষাংশ তেত্রিশের পাতায়)

আটান্নর ফাইনালে বালক-বীর পেলে (ডাইনে)

সুইডেনের বুহ ভেঙে গ্যারিঞ্চা এগোচ্ছেন

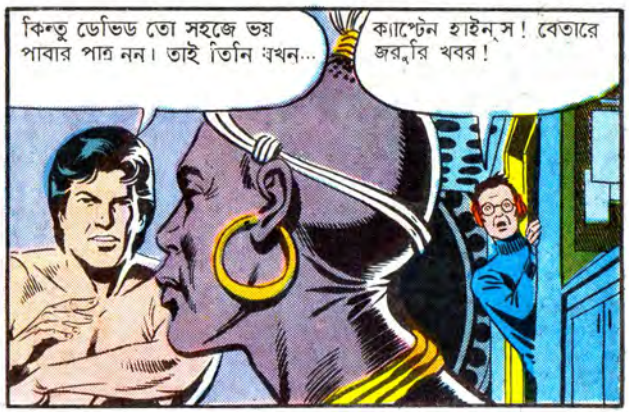

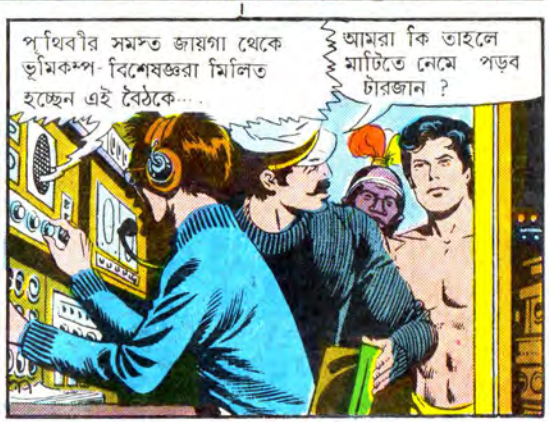

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
পৃথিবীর পেটের মধ্যে তোমার বন্ধু কী এমন ভয়ংকর বিপদের দেখা পেলেন ?
জানি না মুগাম্বি, তাঁর বার্তাটা হঠাৎ মধ্যপথে থেমে যায় !
কিন্তু ডেভিড তো সহজে ভয় পাবার পাত্র নন। তাই তিনি যখন...
ক্যাপ্টেন হাইন্‌স ! বেতারে জরুরি খবর !
সমস্ত মহাদেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প চলছে .....
বিপর্যয়ের খবর টারজানদের উড়োজাহাজ ০-২২০-এ এসে পৌঁছেছে !
পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে ভূমিকম্প-বিশেষজ্ঞরা মিলিত হচ্ছেন এই বৈঠকে....
আমরা কি তাহলে মাটিতে নেমে পড়ব টারজান ?
না, ক্যাপ্টেন ! ডেভিড ইনেসও এই ভূমিকম্পের কথা বলেছিলেন !
বিপর্যয় রোধের ক্ষমতা আছে সম্ভবত একমাত্র আমাদেরই !
ফুলস্পীডে এগোও !
আমরা এখন ৮৫ ল্যাটিচিউডের উপরে !
সামনে সেই শাশ্বত কুয়াশা ! ঠিকপথেই এগোচ্ছি !
কুয়াশা এখানে কাটে না কেন টারজান ?
কাটে না, কারণ ভূগর্ভের গরম বাতাস এখানেই সুড়ঙ্গ পথে বেরিয়ে আসে উত্তরমেরুর আকাশে। সেই সুড়ঙ্গের কাছেই আমরা পৌঁছে গেছি !

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

বিশ্বকাপের খুচরো খবর • হরেক বিস্ময়

১৯৩০-এর প্রথম বিশ্বকাপে ফ্রান্স খেলতে চায়নি। কিন্তু নানা কারণে শেষ পর্যন্ত ওরা উরুগুয়েতে এল। প্রধান কারণ, ফিফার সভাপতি জুলে রিমে বিশ্বকাপটি দিয়েছিলেন। তিনি একজন ফরাসী।

ফ্রান্স কিন্তু নক আউট পর্যায়ে যেতে পারল না। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলায় ৮১ মিনিটের মাথায় ফ্রান্স একটি গোল খেল। খেলা শেষ হতে তখনও ৯ মিনিট বাকি। তিন মিনিট পরে দারুণ পাল্টা আক্রমণ থেকে গোল করার জায়গায় এসে গেলেন ফরাসী ফরোয়ার্ড মাইকেল ল্যাঙ্গিলার। কিন্তু খেলা শেষের বাঁশি বাজিয়ে দিলেন ব্রাজিলের রেফারী আন্তোনিও রেগো।

আর্জেন্টিনার সমর্থকরা মাঠে ঢুকে পড়ল। রেফারী বুঝতে পারলেন, তিনি ৬ মিনিট কম খেলিয়েছেন। সেই ৬ মিনিট তিনি তখনই খেলাতে চাইলেন। পুলিস কোনোরকমে মাঠ পরিষ্কার করল। অনিচ্ছুক ফরাসীরা মাঠে এসে কোনো রকমে ৬ মিনিট মাঠে কাটিয়ে দিল। ফ্রান্স বিদায় নিল প্রথম বিশ্বকাপ থেকে।

ইতালির গোলকীপার জফ

১৯৫৪-র বিশ্বকাপ হাঙ্গারি পায়নি বটে, কিন্তু ওদের বুটের ঠোক্করে চুরমার হয়ে গেল একের পর এক রেকর্ড। মাত্র পাঁচটি ম্যাচে সাতাশ গোল করল হাঙ্গারি। এখনও বিশ্বকাপে এটি রেকর্ড। সাতাশটির মধ্যে এগারোটি গোল একাই করেছিলেন স্যান্ডোর কোসিস।

পেরুর রাইট ব্যাক এবং অধিনায়ক কেসিয়াস ১৯৩০-এর বিশ্বকাপে রুমানিয়ার বিরুদ্ধে খেলায় যখন মাঠে নামেন, তাঁর মতো গর্বিত আর কেউ ছিল না। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই কেসিয়াসকে ড্রেসিং রুমে ফিরে আসতে হয়। কেসিয়াস বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে চিহ্নিত হলেন, যাকে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। সেই হিংস্র খেলায় কেসিয়াসবিহীন পেরু হেরে গেল ৩-১ গোলে।

প্রথম বিশ্বকাপে অনেক মজার ঘটনাই ঘটেছিল। কিন্তু মারকিন যুক্তরাষ্ট্র আর আর্জেন্টিনার খেলায় যা ঘটল তার জবাব নেই। বিরতির পর খেলা শুরু হতেই একজন মারকিন ফুটবলার আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়লেন। টীমের কোচ মাঠে ছুটে এলেন। কিন্তু দৌড়ে আসার সময় তিনি পড়ে গেলেন ওষুধপত্রের ব্যাগের ওপর। ক্লোরোফর্মের একটি শিশি গেল ভেঙে। কোথায় আহত ফুটবলারের শুশ্রূষা করবেন, তা নয়, কোচ নিজেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

প্রথম বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা আর উরুগুয়ের ফাইনাল খেলায় একটি ছোট্ট ঘটনা অনেক বড় হয়ে দাঁড়াল। উরুগুয়ে চাইল নিজের দেশে তৈরি বলে খেলতে। আর্জেন্টিনারও সেই একই কথা। রেফারী সমস্যার সমাধান করলেন চমৎকার ভাবে। দুই দেশের তৈরি বলে খেলা হবে হাফ টাইমের আগে এবং পরে। আগে কোন বলে খেলা হবে, তা ঠিক হল টস করে। টসে জিতলেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক ফেরিরা। কিন্তু জুলে রিমে ট্রফি জিতে নিল উরুগুয়ে।

বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে উরুগুয়ের হেক্টর ক্যাস্ট্রোর নাম। ছোটবেলায় এক দুর্ঘটনায় ক্যাস্ট্রো বাঁ হাত হারান। পেরুর বিরুদ্ধে একমাত্র গোলটি করলেও তিনি পরের খেলায় বাদ পড়েন। ফাইনালেও ক্যাস্ট্রোর নাম ছিল অতিরিক্তের তালিকায়। কিন্তু ম্যাচের ঘণ্টা দুই আগে নিয়মিত খেলোয়াড় আনসেলমো অসুস্থ হয়ে পড়ায় ক্যাস্ট্রো দলে আসেন। উরুগুয়ের শেষ গোলটি আসে তাঁরই পা থেকে।

খেলোয়াড়দের সঙ্গে রাম্‌জে

পেলের কথা কে না জানো? আর পেলের গুরু ব্রিটোর নামও জানো অনেকে। এই ব্রিটোরও কিন্তু বিশ্বকাপে একটি অসাধারণ রেকর্ড আছে।

১৯৩৪ সালে ব্রিটো ইতালিতে খেলতে আসেন ব্রাজিল দলের হয়ে। স্পেনের বিরুদ্ধে প্রথম রাউন্ডের খেলায় ব্রাজিল পেনাল্টি পায়। ব্রিটোই বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার— যিনি পেনাল্টির সুযোগ নষ্ট করলেন। রেকর্ড—কিন্তু কী মর্মান্তিক রেকর্ড! তাই না?

অবিস্মরণীয় পেলে

প্রথম বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক ম্যানুয়েল ফেরিরা। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম খেলাতেই দারুণ আঘাত পেলেন। ফেরিরার জায়গায় সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে দলে এলেন স্ট্যাবিল। মাঠে নেমেই বিশ্বকাপের প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন স্ট্যাবিল। মেক্সিকো হারল ৬-৩ গোলে। মোট চারটি খেলায় ৮ গোল করে সাড়া জাগালেন বদলি খেলোয়াড়।

রাশিয়ার আইভানভ

খেলার কথা ষোলটি দেশের, কিন্তু ১৯৩৪-এ ইতালির বিশ্বকাপের আসরে হাজির ছিল সতেরটি দল। আমেরিকা নাম পাঠিয়েছিল দেরিতে। ঠিক হল, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র খেলবে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে। যে-দল জিতবে, তারাই খেলবে মূল প্রতিযোগিতায়। শেষ পর্যন্ত এই ম্যাচ জিতে মূল আসরে ঢুকে পড়ল সতের নম্বর প্রতিযোগী মারকিন যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৩৪-এর বিশ্বকাপের ফাইনালে এক দুর্দান্ত বাঁক-নেওয়া শটে গোল করেছিলেন ইতালির উইঙ্গার ওরসি। অনেকে বললেন, ঐ শটটি দৈবক্রমে হয়ে গেছে। ওরসি জানালেন, এইরকম শট তিনি যতবার খুশি নিতে পারেন।

পরদিন সকালে সাংবাদিক এবং ফোটোগ্রাফারদের জড়ো করে ওরসি দেখাতে চাইলেন ঐ ভয়ংকর বাঁক-ধরানো শট। পর পর অন্তত কুড়িটি শট নিয়েও ওরসি আগের দিনের মতো কিছু করতে পারলেন না। ফাঁকা গোলে একবারও বল ঢুকল না। ওরসি মাথা নিচু করে ফিরলেন ড্রেসিং রুমে। ফোটোগ্রাফাররা সেই ছবিটিই তুলে নিলেন!

১৯৩৪-এর বিশ্বকাপে অস্ট্রিয়া আর ফ্রান্সের খেলাটিতে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এই প্রথম বিশ্বকাপের একটি খেলা ড্র হল, অতিরিক্ত সময় খেলা হল এবং পেনাল্টিতে গোল হল।

অতিরিক্ত সময়ে গুরুত্বপূর্ণ গোলটি করেন অস্ট্রিয়ান ফরোয়ার্ড স্কাল। ফরাসী ফুটবলাররা দাবি জানালেন : স্কাল অফসাইডে ছিলেন। খেলার পর স্কাল মুখ খুললেন না। কিন্তু বেশ কয়েক বছর পর, এক ইন্টারভিউতে স্কাল বলেন : "হ্যাঁ, আমি অফসাইডেই ছিলাম!"

চেকোস্লোভাকিয়ার দুরন্ত ইনসাইড ফরোয়ার্ড নেজলি ১৯৩৪ এবং ১৯৩৮-এর বিশ্বকাপে মোট ছটি খেলার মধ্যে পাঁচটিতেই গোল করেন। একমাত্র ১৯৩৪-এর ফাইনালে ইতালির বিরুদ্ধে নেজলি কোনো গোল পাননি। শেষ জীবনে নেজলি দুঃখ করতেন : "ঐ ম্যাচটায় আমি গোল করতে পারলে জুলে রিমে কাপ পেত চেকোস্লোভাকিয়া।"

১৯৩৮-এর বিশ্বকাপ হয় ফ্রান্সে। সেমি-ফাইনালে হাঙ্গারি আর সুইডেনের খেলায় দেখা গেল বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্রুততম গোল। খেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই এক নিখুঁত আক্রমণ থেকে বল পেয়ে গোল করেন সুইডেনের ফরোয়ার্ড নাইবার্গ। কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে গোলটি হয়েছিল খেলা শুরু হবার ৩০ থেকে ৩৫ সেকেন্ডের মধ্যে।

১৯৩০ সালে বিশ্বকাপ জেতার পর ১৯৩৪ আর ১৯৩৮-এর বিশ্বকাপে উরুগুয়ে আসেনি। কিন্তু ১৯৩৮ সালে উরুগুয়েতে যায় আর-একটি বিশ্বকাপের সোনার মেডেল। ইতালির সেন্টার হাফ আন্দ্রিয়োলো ছিলেন আগে নিজের দেশে উরুগুয়ে দলেরই খেলোয়াড়। কিন্তু ফ্রান্সে উরুগুয়ে খেলতে না আসায় ইতালি আন্দ্রিয়োলোকে টেনে নেয়।

অদ্বিতীয় পুসকাস

য়, বিপত্তি, বিভ্রাট

১৯৫০ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্বকাপে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গারি, চেকোস্লোভাকিয়া, আর্জেন্টিনা —অনেক দেশই আসেনি। কিন্তু স্কটল্যান্ডের না-আসাটাই ছিল সবচেয়ে বিস্ময়কর।

ব্রিটিশ ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দুটি দল বিশ্বকাপে আসতে পারত। মরশুমের শুরুতেই স্কটল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করেছিলেন : "বিশ্বকাপে গেলে, ব্রিটিশ ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই যাব।"

শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হল। স্কটল্যান্ড দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও আগের ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্বকাপে এল না।

ফুটবলে যে কোনো প্রতিপক্ষকেই দুর্বল ভাবতে নেই, এই শিক্ষা ব্রাজিল পেয়েছিল ১৯৫০-এর বিশ্বকাপে।

প্রথম খেলায় মেক্সিকোকে অনায়াসে ৪—০ গোলে হারানোর পর কোচ ফ্লাভিও কস্টা ভাবলেন, সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে নতুন চারজনকে খেলানো যাক।

খেলা শেষ হবার দুই মিনিট আগে একটি দারুণ গোল করে সুইজারল্যান্ড ফলাফল ২—২ করে দিল। শেষ পর্যন্ত যুগোস্লাভিয়াকে কোনোরকমে হারিয়ে ব্রাজিল ফাইনাল পুলে যায়।

ফাইনাল পুলের দ্বিতীয় খেলায় ব্রাজিল যখন স্পেনের বিরুদ্ধে খেলতে নামে, সেন্টার ফরোয়ার্ড আডেমির তার আগেই ১৯৫০-এর বিশ্বকাপে করে ফেলেছেন সাতটি গোল। স্পেনের কোচ খেলোয়াড়দের বললেন, যেভাবে হোক ঐ আডেমিরকে রুখতে হবে। টীমের দুজন কড়া ডিফেন্ডার আডেমিরের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে গেলেন। ওঁরা ভালভাবেই আডেমিরকে বেঁধে রাখলেন। আডেমির একটিও গোল করতে পারলেন না। কিন্তু ওঁকে আটকে রাখতে গিয়ে অন্য জায়গায় যে ফাঁক হল, তা থেকে একটি নয়, দুটি নয়, ছটি গোল করে গেল ব্রাজিলের অন্য ফরোয়ার্ডেরা।

ফুটবল খেলায় শেষ পর্যন্ত ভাল খেলতে হয়—এই শিক্ষা ফ্রান্স পেয়েছিল উনিশশো বাষট্টির বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্বের খেলায়। শেষ খেলায় বুলগারিয়ার বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট পেলেই ফ্রান্স আসতে পারত চিলিতে।

ফ্রান্স প্রথম থেকে ড্র করার জন্য খেলল। ৮৯ মিনিট খেলা হয়ে গেল। ফ্রান্সের সমর্থকরা নাচতে শুরু করেছেন। খেলোয়াড়রাও ধরে নিয়েছেন কেল্লা ফতে। কিন্তু খেলা শেষের চল্লিশ সেকেন্ড আগে এক অবিশ্বাস্য গোল করে ফ্রান্সকে হারিয়ে দিলেন বুলগারিয়ার সেন্টার ফরোয়ার্ড ইলিয়েভ।

১৯৫৮-র বিশ্বকাপ খেলায় এক অভূতপূর্ব অবস্থার মধ্যে পড়ে উত্তর আয়ারল্যান্ড। আইরিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ম অনুযায়ী রবিবার ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ ছিল। অথচ সুইডেনে বিশ্বকাপের খেলার সূচী দেখে জানা গেল, উত্তর আয়ারল্যান্ডকে খেলতে হবে রবিবারেও। এই নিয়ে উত্তর আয়ারল্যান্ডে তর্কবিতর্ক হল তুমুল। শেষ পর্যন্ত উত্তর আয়ারল্যান্ড সুইডেনে এল।

প্রথম খেলায় উত্তর আয়ারল্যান্ড মুখোমুখি হল চেকোস্লোভাকিয়ার। সেদিন ছিল রবিবার। কিছু আইরিশ কর্মকর্তা গোঁ ধরে খেলা দেখতেই গেলেন না। ওঁরা অবশ্য পরে মাথা চাপড়ালেন। সবাইকে চমকে দিয়ে উত্তর আয়ারল্যান্ড সেই ম্যাচ জিতে গেল উইলবার কুলের অসাধারণ গোলে।

রাশিয়ার ইলিন ও সালানিকভ

সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ১৯৫৪-র বিশ্বকাপের রেকর্ডে এমন পাঁচজন গোলদাতা আছেন, যাঁরা ব্যাপারটা ভুলে যেতেই চেয়েছেন। মেক্সিকোর কার্ডেনাস, ইংল্যান্ডের ডিকিনসন, যুগোস্লাভিয়ার হোরভার্ট, অস্ট্রিয়ার হানাপ্পি এবং উরুগুয়ের ক্রুজ। এই পাঁচজন বল ঢুকিয়েছিলেন নিজের গোলে।

১৯৫৪-র বিশ্বকাপের প্রথম খেলায় হাঙ্গারির হয়ে মাঠে নামলেন সেই এগারোজন ফুটবলার, ১৯৫২-র হেলসিঙ্কি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন দলে যাঁরা ছিলেন। দুর্বল কোরিয়ার বিরুদ্ধে হাঙ্গারি গোল করল গুনে গুনে ৯টি। খেলা শেষে কোরিয়ার গোলকীপার হং বললেন : 'কত গোল খেয়েছি, হিসেব রাখিনি।'

প্রথম তিনটি বিশ্বকাপের আসর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার পর ১৯৫০-এ ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্বকাপে খেলতে এল ইংল্যান্ড।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ম্যাচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং স্পেনের কাছে ইংল্যান্ড হেরে গেল সবাইকে অবাক করে। রাগে-দুঃখে-হতাশায় ভেঙে পড়া ইংরেজ ফুটবলার, কর্মকর্তা, এমন কী সাংবাদিকরাও সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে গেলেন দেশে। প্রথা অনুযায়ী বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা পর্যন্ত ওঁরা থাকেননি।

পশ্চিম জার্মানির ওয়েবার গোল করছেন

উনিশশো ছেষট্টির বিশ্বকাপের সময় প্রথম বড় খবর আসে খেলা শুরুর আগেই। ওয়েস্টমিনস্টার সেন্ট্রাল হল থেকে চুরি যায় জুলে রিমে কাপ।

খোঁজ, খোঁজ। আট দিন পর একটি কুকুরের সাহায্য নিয়ে পুলিস কাপ উদ্ধার করল। ফুটবলের সবচেয়ে দামী আর বিখ্যাত ট্রফি মাটির নীচে ছিল পুরনো খবরের কাগজে মোড়া অবস্থায়। চোরের দু বছর জেল হল। কুকুরের মালিক পেলেন ৬০০০ পাউন্ড।

উনিশশো সত্তরের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ইতালি আর জার্মানির খেলার কথা সোনার জলে লেখা থাকবে।

খেলা শুরুর আট মিনিট পর গোল দিয়ে এগিয়ে যায় ইতালি। শেষ বাঁশি বাজার কয়েক সেকেন্ড আগে গোল শোধ করে জার্মানি।

অতিরিক্ত সময়ে হয় পাঁচ-পাঁচটি গোল। ইতালি ফাইনালে যায় ৪—৩ গোলে জিতে।

১৯৫৮-র বিশ্বকাপে পুলের শেষ ম্যাচে ব্রাজিলের কোচ ভিনসেন্ট ফিওলা মাঠে নামালেন দুটি নতুন ছেলেকে। এই দুজনই পরের ম্যাচগুলিতে ব্রাজিলকে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত করল। হয়তো বুঝতে পেরেছ, এই দুজনের নাম পেলে আর গ্যারিঞ্চা।

১৯৫৮-র বিশ্বকাপে ব্রাজিলের একজনই বলার মতো আঘাত পেয়েছিলেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে মরণপণ খেলায় ৭৭ মিনিটের মাথায় চমৎকার গোল করলেন ভাভা। খুশির চোটে ব্রাজিলের প্রায় সব ফুটবলার ভাভার গায়ে, পিঠে, মাথায় গিয়ে পড়লেন। সকলে উঠে যাবার পর দেখা গেল, ভাভা শুয়ে আছেন মাটিতে। অভিনন্দনের চোটে ভাভাকে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে হল শুশ্রূষার জন্য।

উনিশশো আটান্নর সুইডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড এনেছিল কুড়িজন ফুটবলার। চারটি ম্যাচে মোট পনেরোজন মাঠে নামেন। যাঁরা মাঠে নামার সুযোগ পাননি, তাঁদের মধ্যে একজন পরের পনেরো বছর ইংল্যান্ড দলে অপরিহার্য ছিলেন। সেই দুর্দান্ত ফুটবলারের নাম ববি চার্লটন।

উনিশশো সত্তরের বিশ্বকাপে বেলজিয়াম আর এল সালভাদোরের খেলা শুরু হল অনেক দেরিতে। মাঠ কি অনুপযুক্ত ছিল? না। রেফারী কি তৈরি ছিলেন না? ছিলেন।

আসলে উদ্যোক্তারা জানতেন না যে, এল সালভাদোরের জাতীয় সংগীত এত দীর্ঘ। বিশ্বকাপের যে-কোনো খেলা শুরুর আগে দুই দেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়।

১৯৭০-এর বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্রাজিলের প্রথম গোল করেন পেলে। বিশ্বকাপের আসরে এই নিয়ে ব্রাজিল করল ১০০ গোল। শততম গোলটি করলেন পেলে।

মেক্সিকোর গোলকীপার আন্তোনিও কারবাজাল হাজির থেকেছেন পাঁচ-পাঁচটি বিশ্বকাপের আসরে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৬—সব বিশ্বকাপেই খেলে গেছেন কারবাজাল।

হল্যান্ডের ক্রুইফ

উনিশশো বাষট্টির বিশ্বকাপে উরুগুয়ের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিল সতেরো বছর বয়সী ম্যানুয়েল মোলিনা গঞ্জালেস। যে হোটেলে উরুগুয়ের ফুটবল দল ছিল, গঞ্জালেস সেখানেই কাজ করত।

ছেলেটি উরুগুয়ের দলের সঙ্গে রোজ মাঠে যেত। শেষ পর্যন্ত উরুগুয়ে হেরে গেল যুগোস্লাভিয়ার কাছে। এই শোক সহ্য করতে না পেরে হার্ট ফেল করল গঞ্জালেস। ওকে কবর দেবার সময় কান্নাভেজা চোখে হাজির থাকলেন উরুগুয়ের সমস্ত ফুটবলার।

ফাইটার

পাজি...গণ্ডার...গণ্ডাহাতি...সাহস থাকে তো বেরিয়ে আয়!
জেব্রা...জিরাফ... জলহস্তী...
ওই দ্যাখো!..
বেবুন!
গিরগিটি!
বাঁদর!
হনুমান!
আরে, পাখি?
হ্যাঁ! এদের পূর্বপুরুষরা তোমার সেই পূর্বপুরুষের মুখের বুলি চটপট শিখে নিয়েছিল...তারপর বংশানুক্রমে সেই বুলি এরা আউড়ে যাচ্ছে!
উল্লুক...বোল্লুক... রোম্বেটে...ভাগ!
কী, আমি রোম্বেটে?
দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি!
এই নারকোল দিয়ে তোর মাথা ফাটাব!
উঃ, রগে টান পড়েছে!
দাঁড়াও, মালিশ করে দিচ্ছি!
বন্দুকটা দাও তো...পাখির বংশ আজ ধ্বংস করে ছাড়ব!

(এর পর চৌত্রিশের পাতায়)

গোয়েন্দা বাজ

12-8
বাঃ, এ তো দিব্যি জায়গা!
এই ছাগল গুলো দুধ দেয়?
দেয়। এক্ষুনি আপনার মধু এনে দিচ্ছি।
ডনি ডাণ্ডি...সুন্দর নাম। ছেলেটিকে যতই দেখছি, ততই ভাল লাগছে। ভারী ভাল ছেলে।
ম্যাঁ...ম্যাঁ!

আমি কক্ষনো ওয়াশিংটনে যাইনি। কী রকম দেখতে জায়গাটা?
নিজের চোখে দেখবে?
তাহলে আমাদের সঙ্গে এসো।
মানে...আপনারা আমাকে ওয়াশিংটনে নিয়ে যাবেন?
হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতেই তুমি থাকবে।
কেব! কেব! দিন কয়েকের জন্যে আমি ওয়াশিংটনে যাচ্ছি। আমার ছাগলগুলোকে তুমি একটু দেখবে?
12-9

কেব আমার ছাগলগুলোর দেখাশোনা করবে। ব্যস, তাহলে আমি যেতে পারি।
তোমার জামাকাপড় গুছিয়ে নেবে না?
এই বাক্সের মধ্যেই সব আছে।
12-10
আমি বাইরে যাচ্ছি। কয়েকটা দিন তোরা একটু ভাল হয়ে থাকিস।

নদীর এই পারে আমরা থাকি। ঠিক ও-পারেই হল ওয়াশিংটন।
তাই বুঝি?
আমাদের ছেলে এখন বিদেশে। এটা তার ঘর। এখানেই তুমি থাকবে।
12-11
দাঁড়াও, এক্ষুনি আমি ডিনার তৈরি করে ফেলছি।
বোসো, ডনি, একটু জিরিয়ে নাও।
এইটাতে বসব? নোংরা হয়ে যাবে যে!

ক্রমশ

(পঁচিশের পাতার পর)

ফুটে ওঠেন ; আর সেবারই ব্রাজিল অন্য সব দেশকে দেখিয়ে দেয় ৪-২-৪ পদ্ধতিতে ঠিক কেমন খেলা হয়।

জুন মাসের ২৯ তারিখে যে দল ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে সুইডেনকে ৫—২ গোলে পরাজিত করে, তাতে ছিলেন গিলমার গোলে ; চারজন ডীপ-ডিফেন্ডার—জালমা স্যানটোস, অধিনায়ক বেলিনি, অরলান্ডো আর নীলটন স্যানটোস ; মাঝমাঠে লিঙ্ক-ম্যান জিটো আর ডিডি ; আর ফরোয়ার্ডে গ্যারিঞ্চা, ভাভা, পেলে আর জাগালো। বরাবরই কিন্তু এই টীম খেলেনি ঃ জালমা স্যানটোস তো খালি ফাইনালেই খেলেন, তার আগে রাইট-ব্যাকে ছিলেন ডি সোর্ডি। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপের প্রথম ম্যাচে ব্রাজিল ৩—০ জেতে, তবে সেই দলে ছিলেন না জিটো, গ্যারিঞ্চা, ভাভা বা পেলে ; আর পেপে অসুস্থ ছিলেন বলেই কেবলমাত্র জাগালো খেলার সুযোগ পান।

তবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলা গোলশূন্য হলে কোচ ফিওলা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পেলেকে মাঠে নামান, আর অন্যান্য প্লেয়াররা প্রায় জোর করিয়েই আউটসাইড-রাইটে গ্যারিঞ্চাকে খেলাতে বাধ্য করেন। সেই খেলায় ব্রাজিল জেতে ২—০, আর কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়েলসকে মাত্র এক গোলে পরাজিত করে, কিন্তু ইতিমধ্যে টীম ঠিকমতন গড়ে উঠছিল। সেমি-ফাইনাল আর ফাইনালে ব্রাজিলের খেলা সত্যিই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। প্রথমে ফ্রান্স, তারপর সুইডেন—দুজনেই হারে ২ ৫ গোলে।

সেইবারের কাপ-বিজয়ী দলের গোলরক্ষক গিলমার ব্রাজিলের হয়ে মোট একশোটি ম্যাচে খেলেন। তখন তাঁর বয়স আঠাশের কাছাকাছি। চেহারায় সুদর্শন, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখান। গিলমারের পজিশন-জ্ঞান এত ভাল ছিল যে, তাঁকে অপ্রয়োজনীয় লাফ-ঝাঁপ করতে হত না ঃ তাঁর অচঞ্চল মেজাজ সারা রক্ষণভাগকে যেন মাথাঠাণ্ডা রাখত। রাইট-ব্যাকে লম্বা-চওড়া নিগ্রো জালমা স্যানটোস খুব ভাল মার্কিং করতেন, আবার সময় বুঝে "ওভারল্যাপ" করে বল নিয়ে এগিয়েও যেতেন। গিলমারের মতন তিনিও ব্রাজিলের প্রতিনিধিত্ব করেন মোট একশোটি খেলায়। দুই স্টপার-ব্যাক ছিলেন বেলিনি আর অরলান্ডো। অনেকে মনে করেন বেলিনি যদি ওই দলের ক্যাপ্টেন না হতেন, তাহলে সুইডেনে তাঁর জায়গায় মাউরো স্থান পেতেন। তবে অসাধারণ প্লেয়ার না হলেও বেলিনি ও অরলান্ডো দুজনেই চ্যাম্পিয়ন দলে নিজ দায়িত্ব পালন করে খেলেন। লেফ্‌ট-ব্যাকে খেলেন নীলটন স্যানটোস (তিনি সাদা-চামড়া, জালমার কেউ নন) —তখন তাঁর বয়স প্রায় তেত্রিশ হলেও অনেক অল্পবয়স্ক উইঙ্গারদের অনায়াসে সামলে রাখতেন। তাঁর খেলার ভঙ্গি জালমা স্যানটোসের থেকে বেশি আক্রমণাত্মক ছিল সব নিয়ে তিনি বিরাশিবার ব্রাজিলের জন্য খেলেন।

ব্রাজিলের দুই মিডফীল্ডম্যানের মধ্যে ডিডি ছিলেন আউট-স্ট্যান্ডিং। তাঁর সঙ্গে জিটোর বোঝাপড়া খুব ভাল বলেই জিটো প্রথম সুযোগ পান—রাইট-হাফে জিটো তাঁর চমৎকার ট্যাক্‌-লিংয়ের সাহায্যে অনেক বল জোটান। তবে আটান্নয় ব্রাজিল দলে আক্রমণ রচনা করতেন নিগ্রো প্লেয়ার ডিডি। তাঁর মুখ দেখে বা চলার গতি থেকে বোঝা যেত না তিনি কাকে বল পাস করবেন। ফলে যখন তিনি বল নিয়ে এগোতেন, তখন অপরপক্ষের ডিফেন্ডারদের মাথাব্যথা আরম্ভ হত। ডিডির ডিস্ট্রিবিশন আর পাস, দুটিই প্রায় নিখুঁত ছিল। সেবারে সুইডেনে সাংবাদিকরা পেলেকে নিয়ে যতই মাতামাতি করুক না কেন, সবাই স্বীকার করেছিলেন, ব্রাজিলের "মাস্টারমাইন্ড" ডিডি-ই।

রাইট-উইংয়ে গ্যারিঞ্চার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর হঠাৎ করে স্পীড ছাড়বার ক্ষমতা। তাছাড়া তাঁর বাঁ পা ছেলেবেলা

ট্রেনিং ক্যাম্পে (বাঁ থেকে ডাইনে) জালমা স্যানটোস, জিটো, ভাভা

থেকে একটু বাঁকা বলে গ্যারিঞ্চা এক অসাধারণ "আউটসাইড ডজ" দেওয়াটা দারুণভাবে রপ্ত করেছিলেন। ব্রাজিলের সাফল্যের এক প্রধান কারণ প্রতিযোগিতার মাঝামাঝি গ্যারিঞ্চার মতন প্রতিভাবান প্লেয়ারকে দলে এনে তাঁর নিজের কায়দায় খেলার সুযোগ দেওয়া। লেফ্‌ট-উইংয়ে খেলেছিলেন জাগালো। তবে গ্যারিঞ্চার মতন তিনি কেবলই আউটসাইডের প্লেয়ার ছিলেন না ঃ ৪-২-৪ প্রথায় জাগালোর কাজ ছিল আক্রমণের সময়ে এগিয়ে যাওয়া আবার দল মুশকিলে পড়লে নেমে গিয়ে রক্ষণভাগকে সহায়তা করা। জাগালোর স্ট্যামিনা ছিল অসাধারণ, তাঁর বিপক্ষ দল ভাবতেই পারত না একজন প্লেয়ার এত বেশি আক্রমণ-রক্ষণ দু'দিকই বজায় রাখে কী করে। ফাইনালে জাগালো নিজের গোল-লাইন থেকে হেড করে প্রথমার্ধে এক নিশ্চিত গোল বাঁচান আর দ্বিতীয়ার্ধে নিজে গোল করেন! ফরোয়ার্ড-লাইনের আরেক প্লেয়ার ছিলেন ভাভা ঃ খুব চটপটে, খুব সাহসী, খুব তেজী। সেন্টার-ফরোয়ার্ডের কাজই হল সামান্য সুযোগকে গোলে পরিণত করবার চেষ্টা করা, আর ভাভা সেই কাজ তাঁর পুরো ক্ষমতা দিয়ে করতেন।

আর ছিলেন—পেলে। তাঁকে নিয়ে অনেক কিছুই বলা যায়। তবে সুইডেনে যখন গেলেন, পেলের বয়স ১৮ পূর্ণ হতে তখনও মাস চারেক বাকি। তাঁর বল-কন্ট্রোল দারুণ হলেও বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা তাঁকে শায়েস্তা করতে সাংঘাতিক কোনও ব্যবস্থা করেনি। তবে পেলে তাঁর আত্মকথায় একটি মজার ঘটনার কথা বলেছেন।

আজকাল বড় বড় টীমের সঙ্গে সাইকোলজিস্ট নিয়মিত থাকে। তবে ১৯৫৮ সালে ব্রাজিল দলের সঙ্গে প্রথম এক সাইকোলজিস্ট পাঠানো হয় ঃ তিনি সমস্ত প্লেয়ারকে লক্ষ করে নিজের গবেষণা করতেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে খেলার আগে যখন ডাক্তার বলেন, পেলের হাঁটু সুস্থ, সে খেলতে পারে, এই সাইকোলজিস্ট তখন বলেন, "গ্যারিঞ্চার 'সোফিস্টিকেশন'-এর অভাব এত বেশি, তাঁকে খেলানো ভুল হবে। আর পেলে বড্ড বাচ্চা—তাঁর প্রয়োজনীয় ফাইটিং স্পিরিট নেই, তাছাড়া দলীয় খেলায় যে দায়িত্ববোধ দরকার তাও নেই ; তাঁকে মোটেই মাঠে নামানো উচিত নয়।"

এইসব শুনে ফিওলা আস্তে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, "আপনি হয়তো ঠিক কথাই বলছেন। তবে মুশকিল এই, আপনি ফুটবল সম্পর্কে কিছুই জানেন না!" আর পেলে গ্যারিঞ্চা সত্যিই সেবার দেখিয়ে দিয়েছিলেন, চ্যাম্পিয়ন দলের প্লেয়াররা কেমন খেলে!

(একত্রিশের পাতার পর)

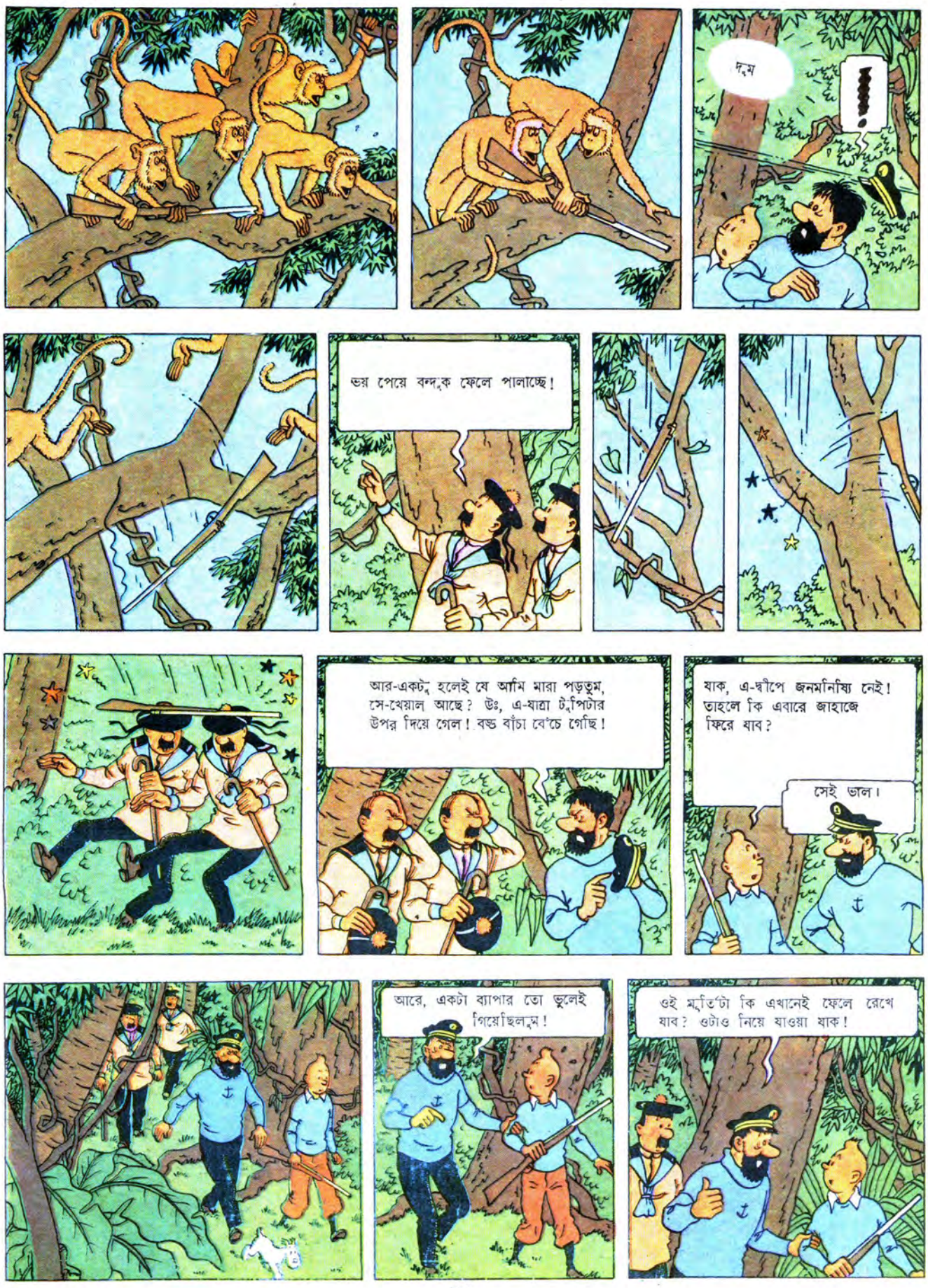

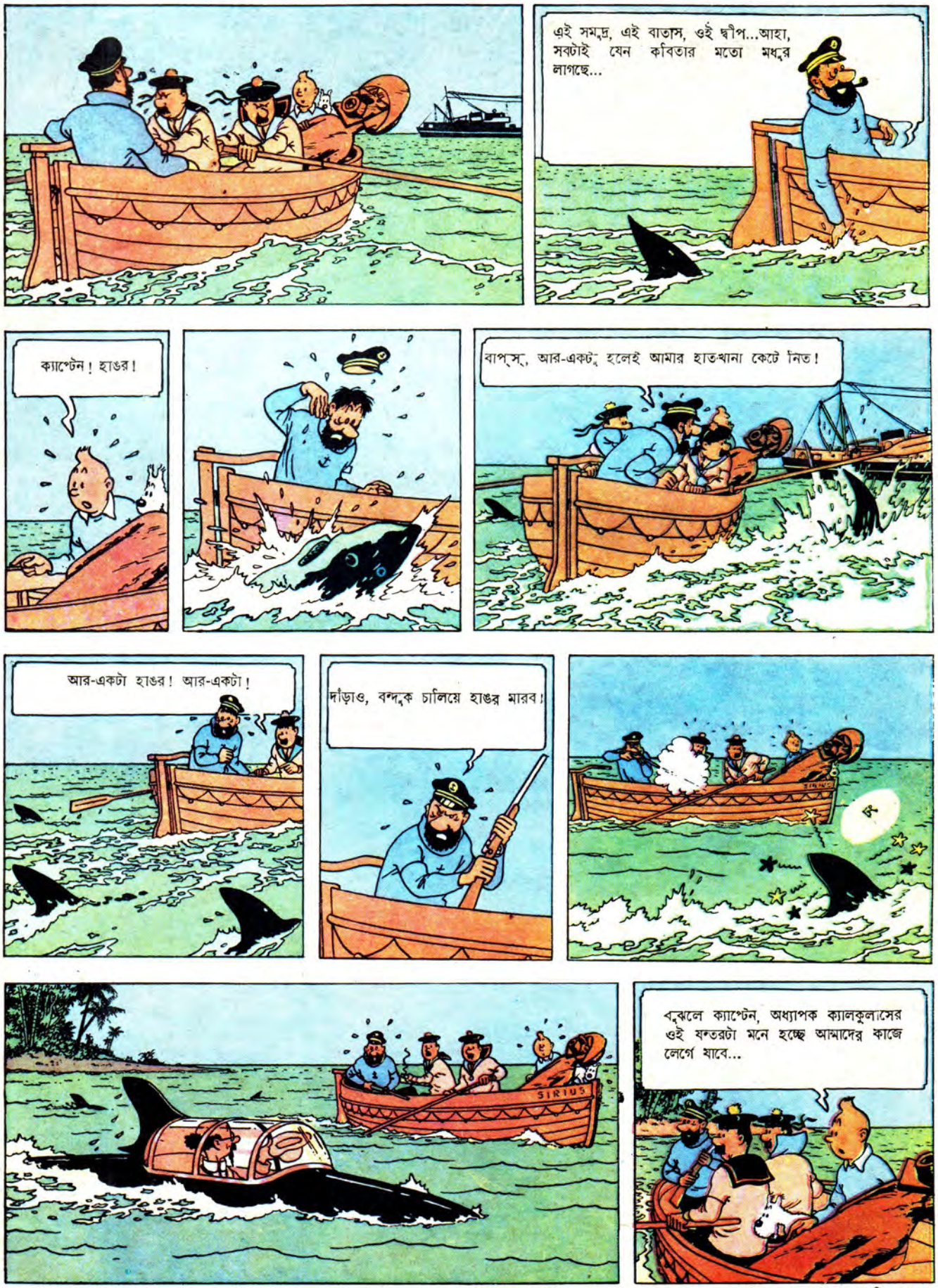

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

বিশ্বকাপ ফুটবল / সচিত্র ধারাবিবরণী

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

হাঙ্গারি • চেকোস্লোভাকিয়া পোল্যাণ্ড • যুগোস্লাভিয়া • রাশিয়া

অশোক দাশগুপ্ত

১৯৫৩ সালের ২৫ নভেম্বর। সেদিন লণ্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম ছিল মৃদু কুয়াশায় ঢাকা। বিলি রাইট, স্ট্যানলি ম্যাথুজের ইংল্যাণ্ড খেলছে হাঙ্গারির বিরুদ্ধে। এই সেই দুনিয়া-কাঁপানো হাঙ্গারি দল, আগের সাড়ে তিন বছরে যারা একটিও আন্তর্জাতিক ম্যাচে হারেনি। ইংল্যাণ্ডের রেকর্ডও দারুণ : দেশের মাটিতে একশো বছরের ফুটবল-ইতিহাসে একবারও ঘটেনি পরাজয়।

কিন্তু খেলা শুরু হবার নব্বুই সেকেণ্ডের মধ্যে প্রায় নব্বুই হাজার দর্শক বুঝে গেল, ইংল্যাণ্ড হার এড়াতে পারছে না। সারা মাঠে তখন ঝলমল করছে হাঙ্গারির বিখ্যাত 'ম্যাজিক ম্যাগেয়ার্স' তাদের জার্সির রঙ টকটকে লাল।

কোনো-কোনো সতর্ক সাংবাদিক অবশ্য তখনও মুখ খুললেন না। ভাবলেন, এটা যদি 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' হয়! সব সন্দেহ নির্মূল হল ১৯৫৪ সালের ২৩ মে। বুদাপেস্তে ফিরতি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ইংল্যাণ্ড হারল ১—৭ গোলে।

এর ঠিক তিন সপ্তাহ পরে বিশ্বকাপে খেলার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে হাজির হল হাঙ্গারি।

প্রথম খেলায় হাঙ্গারি কোরিয়াকে হেসেখেলে ৯—০ গোলে হারাল। পুলের দ্বিতীয় খেলায় পশ্চিম জার্মানিকে হারাল ৮—৩ গোলে। কিন্তু এই ম্যাচে জার্মান ফরোয়ার্ড লেব্রিদের লাথিতে আহত হয়ে মাঠ ছাড়লেন পুসকাস।

কোয়ার্টার ফাইনালে এক মাথা-গরম-করা ম্যাচে পুসকাস-বিহীন হাঙ্গারি ব্রাজিলকে হারাল ৪—২ গোলে। এপর্যন্ত তিনটি ম্যাচে হাঙ্গারি করল একুশ গোল।

হাঙ্গারি-ব্রাজিল খেলা হয়েছিল জঘন্য পরিবেশে। কিন্তু এক বৃষ্টিভেজা বিকেলে হাঙ্গারি-উরুগুয়ের সেমি ফাইনাল ম্যাচ বিশ্বকাপ-ফুটবলের এক স্মরণীয় ম্যাচ হিসেবে চিহ্নিত হল। হাঙ্গারি জিতল ৪—২ গোলে। এ পর্যন্ত কোজিস একা করেছেন দশটি গোল।

১৪ মে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে হাঙ্গারির ফাইনাল। খেলা শুরু হবার সাত মিনিটের মধ্যেই হাঙ্গারি দুই গোলে এগিয়ে গেল। হাতের মুঠোয় এখন বিশ্বকাপ। কিন্তু এইবার ঘুরে দাঁড়াল পশ্চিম জার্মানি। পাল্টা আক্রমণের প্রথম ধাক্কাতেই একটি গোল শোধ করলেন মরলক।

হাঙ্গারির সেই চোখ-ধাঁধানো খেলা যেন হারিয়ে গেল। আহত পুসকাস খেললেন ঢিমে তালে। ষোল মিনিটের মাথায় এক দুর্দান্ত গোল দিয়ে ফলাফল ২—২ করলেন হেলমুট রান। এরপর তেতে উঠল হাঙ্গারি। কিন্তু জার্মান গোলকীপার অসাধারণ খেললেন। খেলা শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে আবার গোল করল জার্মানি। এবারও হেলমুট রান। শেষের বাঁশি বাজার দু মিনিট আগে পুসকাসের নিখুঁত শট জার্মানির গোলে ঢুকল। হাঙ্গারির খেলোয়াড়রা জড়িয়ে ধরলেন পুসকাসকে। কিন্তু অফসাইডের অভিযোগে গোল নাকচ হল। আত্মজীবনীতে পুসকাস জানিয়েছেন : এটি নিশ্চিত গোল ছিল।

হাঙ্গারি প্রথম বিশ্বকাপের চূড়ান্ত আসরে আসে ১৯৩৪ সালে ইতালিতে। প্রথম ম্যাচেই চমক লাগায় মিশরকে ৪—২ গোলে হারিয়ে। কিন্তু পরের খেলায় অস্ট্রিয়ার কাছে হেরে গেল ১—২ গোলে।

১৯৩৮ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের প্রথম রাউণ্ডে হাঙ্গারি ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজকে নাস্তানাবুদ করল ৬—০ গোলে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে হাঙ্গারির জয় ২—০ গোলে। দুটি ম্যাচে চারটি গোল করলেন সেঞ্জেলার। সেমি-

পুসকাস (বাঁ পায়ের বিখ্যাত শট)

ফাইনালে সুইডেন কচুকাটা হল ১—৫ গোলে। তিন গোল একা সেঞ্জেলারের। ফাইনালে কিন্তু হাঙ্গারি হেরে গেল যোগ্য দল ইতালির কাছে, ২—৪ গোলে।

হাঙ্গারি এরপর বিশ্বকাপের আসরে আসে ১৯৫৪ সালে, যার কথা আগেই বলেছি।

১৯৫৮ সালে প্রথম খেলায় ওয়েলসের সঙ্গে ড্র করল ১—১। তৃতীয় ম্যাচে অবশ্য মেক্সিকোকে অনায়াসে হারাল চার গোলে। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে সুইডেনের কাছে ১—২ গোলে হেরে যাওয়ায় হাঙ্গারি কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে পারল না।

বিস্ময়কর টেনিদার অবিস্মরণীয় ট্রিলজি

টেনিদার অভিযান

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অমরসৃষ্টি পটলডাঙার চারমূর্তি এখন কিংবদন্তী খ্যাত। এদের লীডার টেনিদা যাঁর খাঁড়ার মতো নাক, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। গড়ের মাঠের গোরা থেকে চোরাবাজারের চালিয়াৎ পর্যন্ত ঠেঙিয়ে চ্যাম্পিয়ন। ঢাকাই বাঙাল হাবুল সেন, বাঙাল কথা বললেও পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবে প্রচুর টাকা চাঁদা দেয়। ক্যাবলাটা লেখাপড়ায় ভাল। শুধু টকাটক পরীক্ষায় পাশ করে। বেচারা প্যালা সারা বছর পালাজ্বরে ভোগে, সিঙ্গি মাছের ঝোল ও বাসকপাতার রস খায়। এই হল চারমূর্তির পরিচয়।

কিন্তু সত্যিই কি কেউ জানে চারমূর্তির আত্মপ্রকাশ কবে? কবে কোথায় কোথায় এরা অভিযানে বেরোয়? এবং এইসব অভিযানের পরিসমাপ্তিই বা কিভাবে ঘটে?

এই সবকটি অভিযান সর্ব প্রথম একসংগে প্রকাশিত হল। চারমূর্তি একমাত্র ছাত্র অবস্থায়ই পরপর তিনটে অভিযানে বেরোয়—একবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে। রাঁচীর কাছে ঝন্টি পাহাড়ীতে। তারপর সিটি কলেজে ভর্তি হয়ে দুবার। প্রথমে প্লেনে চেপে ডুয়ার্সে কুট্টিমামার কাছে—পরের বার দার্জিলিংয়ের কাছে নীল পাহাড়ীতে। এই তিনটে উপন্যাসেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর সৃষ্টি টেনিদাসহ চারমূর্তি অমর হয়ে রয়েছে—এবং আগামী বহু শতাব্দী অমর হয়ে থাকবে। এবং চারমূর্তি, চারমূর্তির অভিযান ও ঝাউবাংলোর রহস্য এই তিনটি উপন্যাসই প্রকৃত অর্থেই ট্রিলজি উপন্যাস। এই সংগে অনেক খুঁজে পেতে সংযোজন করা হয়েছে— টেনিদার চরিত্রের মূল সূত্র— টেনিদা কে? কি? কবে? কেন? কোথায়? টেনিদা সত্যিই কি আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে?

চা-র-মূ-র্তি কে

সিনেমায় দেখার আগে এখুনি পড়া দরকার।

টেনিদার সবকটি অভিযান একসংগে ১০·০০

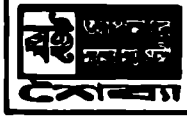

প্রকাশন বিভাগ ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩, ফোন ৩৪৮৫৪৩

১৯৬২ সালে হাঙ্গারি চিলিতে এল অনেক ভাল টীম নিয়ে। টিশি তো ছিলেনই, ফরোয়ার্ড লাইনে যোগ দিলেন জাত-খেলোয়াড় ফ্লোরিয়ান অ্যালবার্ট।

কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে হাঙ্গারি হেরে গেল চেকোস্লোভাকিয়ার কাছে (০—১)।

অ্যালবার্ট এবং বেনের মতো কুশলী ফরোয়ার্ড নিয়ে ১৯৬৬ সালে হাঙ্গারি এল ইংল্যাণ্ডে। প্রথম ম্যাচে পর্তুগালের কাছে হার ১—৩ গোলে। কিন্তু পরের ম্যাচেই ব্রাজিলের বিরুদ্ধে স্মরণীয় জয় ৩—১ গোলে। গোল করলেন বেনে, ফারকাস আর মেজোলি। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে হাঙ্গারি নিবে গেল।

পরের দুটি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে হাঙ্গারি আসতে পারেনি। এবার আর্জেন্টিনায় অবশ্য আসছে হাঙ্গারি। কিন্তু হাঙ্গারির গৌরবসূর্য আজ অস্তমিত।

হাঙ্গারিরই মত দুবার বিশ্বকাপের ফাইনালে এসেও জুলে রিমে কাপ পায়নি আর একটি দেশ—চেকোস্লোভাকিয়া।

প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে এসে ট্রফি প্রায় জিতেই নিয়েছিল চেকোস্লোভাকিয়া। কিন্তু জেতা হল না। তাঁদের হারিয়ে প্রথমবার কাপ ঘরে তুলল ইতালি। চেক দল আবার ফাইনালে উঠেছিল ১৯৬২ সালে।

কিন্তু আগের কথা আগে। ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সে বসল বিশ্ব-কাপের আসর। চেক দলে এবারও আছেন দুর্দান্ত ফরোয়ার্ড নেজলি। প্রথম খেলায় হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জিতল ৩—০ গোলে। শেষ গোল নেজলির।

দ্বিতীয় রাউণ্ডে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলা ১—১ হল। চেকোস্লোভাকিয়ার হয়ে গোল করলেন সেই নেজলি। কিন্তু এই ম্যাচে ব্রাজিলের উইং হাফ জেজে তাঁকে নৃশংসভাবে মারলেন।

রিপ্লে ম্যাচে নেজলির-বদলে-দলে-আসা কোপেকি চেক দলকে এক গোলে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ছিনিয়ে নিল ব্রাজিল (২—১)।

১৯৫৪ সালে সুইজারল্যাণ্ডে অবশ্য চেকরা কিছুই করতে পারল না। পুলের প্রথম ম্যাচে উরুগুয়ের কাছে হারল ০—২ গোলে। পরের ম্যাচে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থা আরও শোচনীয় (০—৫)।

সুইডেনে (১৯৫৮) চেকোস্লোভাকিয়া প্রথম খেলায় ০—১ গোলে হেরে গেল উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের কাছে। কিন্তু দ্বিতীয় খেলায় শক্তিশালী পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে করল ২—২। কিন্তু অবাক খেলা দেখাল পুলের শেষ ম্যাচে। আর্জেন্টিনা বিধ্বস্ত হল ৬—১ গোলে। চেক সেণ্টার হাফ পপলুহার খেললেন অসাধারণ ফুটবল। তিন পয়েণ্ট পাওয়ায় চেকোস্লোভাকিয়া আর উত্তর আয়ারল্যাণ্ড আবার মুখোমুখি হল প্লে-অফ ম্যাচে। চেকোস্লোভাকিয়া হারল ১—২ গোলে। সুতরাং বিদায়।

১৯৬২ সালে চিলিতে চেক দল এল যথেষ্ট শক্তি নিয়ে। প্রথম ম্যাচে চেক দল স্ত্রিবানির গোলে হারাল স্পেনকে (১—০)। দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ১—১।

কিন্তু পুলের তৃতীয় খেলায় চেকোস্লোভাকিয়ার হল অভাবনীয় পরাজয়। মেক্সিকো এই ম্যাচ জিতল ৩—১ গোলে। অবশ্য তিন পয়েন্ট পেয়ে এর আগেই চেক দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গিয়েছিল।

কোয়ার্টার ফাইনালে হাঙ্গারির বিরুদ্ধে অসাধারণ খেললেন চেক গোলকীপার স্রইফ। শেষ পর্যন্ত শেরারের একমাত্র গোলে সেমি ফাইনালে পৌঁছে গেল চেকোস্লোভাকিয়া।

সেমি ফাইনালে চেকোস্লোভাকিয়া মুখোমুখি হল যুগো-স্লাভিয়ার। এদিনও দারুণ খেললেন স্রইফ। চেক দল জিতল ৩—১ গোলে। দুটি গোল করলেন শেরার।

দ্বিতীয়বার ফাইনালে এল চেকোস্লোভাকিয়া। পেলেবিহীন

ব্রাজিলকে হারিয়ে জুলে রিমে কাপ ঘরে তোলা যাবে কি? পেলে নেই, কিন্তু গ্যারিঞ্চা আছেন। আছেন পেলের বদলি আমারিল্ডো। খেলার শুরুতেই কিন্তু অঘটন ঘটালেন চেক উইং হাফ মাসোপোস্ট। আমারিল্ডো ১—১ করলেন। জিটো এবং ভাভার গোলে শেষ পর্যন্ত ৩—১ গোলে জিতল ব্রাজিল।

পোল্যান্ড ১৯৩৮ সালে প্রথম এল বিশ্বকাপের আসরে। প্রথম রাউণ্ডে এক চিত্তাকর্ষক খেলায় ব্রাজিল পোল্যান্ডকে হারাল ৬—৫ গোলে। অনেক বছর পর ১৯৭৪-এ পোল্যান্ড পশ্চিম জার্মানিতে এল রীতিমত ভাল দল নিয়ে।

প্রথম পুল ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে হারায় ৩—২ গোলে। দুর্দান্ত ফরোয়ার্ড লাটো করলেন দুটি গোল। পরের ম্যাচে পোল্যাণ্ডের তোপের মুখে উড়ে গেল হাইতি (৭—০)। এদিনও লাটো পেলেন দুটি গোল। পুলের শেষ ম্যাচে ইতালি হারল ১—২ গোলে।

কোয়ার্টার ফাইনাল লীগ পর্যায়ে প্রথম খেলায় সুইডেনের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড জিতল এক গোলে। গোল সেই লাটোর। পরের ম্যাচে তীব্র লড়াইয়ের পর যুগোস্লাভিয়া হারল ১—২ গোলে। পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় গোল দিলেন লাটো। শেষ খেলায় জিতলেই ফাইনাল। কিন্তু মুলারের একমাত্র গোলে জিতে গেল পশ্চিম জার্মানি।

১৯৩০-এর বিশ্বকাপে যুগোস্লাভিয়া প্রথম ম্যাচেই ব্রাজিলকে হারায় ২—১ গোলে। দ্বিতীয় ম্যাচে বলিভিয়ার বিরুদ্ধে জয় ৪—০ গোলে। দুটি ম্যাচে বেক করলেন ৩ গোল। সেমি ফাইনালে কিন্তু উরুগুয়ের কাছে ঘটল শোচনীয় পরাজয়।

১৯৫০-এ যুগোস্লাভিয়া ব্রাজিলে এল শক্তিশালী দল নিয়ে। পুলের প্রথম ম্যাচে সুইজারল্যাণ্ডকে ৩—০ এবং দ্বিতীয় ম্যাচে মেক্সিকোকে ৪—১ গোলে হারাল। সেরা খেলোয়াড় মিটিক আহত থাকায় যুগোস্লাভিয়া ব্রাজিলের বিরুদ্ধে দুর্বল হয়ে মাঠে নামল। ব্রাজিল জিতে গেল ২—০ গোলে।

১৯৫৪ সালে প্রথম পুল ম্যাচে যুগোস্লাভিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিতল এক গোলে। দ্বিতীয় ম্যাচ ব্রাজিলের সঙ্গে। জেবেকের দেওয়া গোল শোধ করলেন ব্রাজিলের ডিডি। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির কাছে হারতে (০—২) হল প্রধানত গোলকানা ফরোয়ার্ডদের জন্য।

১৯৫৮ সালে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে যুগোস্লাভিয়া অনেক ভাল খেলেও স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে ১—১ করল। দ্বিতীয় ম্যাচে ফ্রান্সকে হারাল ৩—২ গোলে। কিন্তু পুলের তৃতীয় ম্যাচে বিখ্যাত গোলকীপার বেয়ারার ব্যর্থতায় প্যারাগুয়ের সঙ্গে খেলা ৩—৩ হল। কিন্তু হারতে হল পশ্চিম জার্মানির কাছে।

১৯৬২ সালে প্রথম খেলাতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুগোস্লাভিয়ার হার ০—২ গোলে। লেভ ইয়াসিন দারুণ খেলা দেখালেন। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে জিত হল উরুগুয়ের বিরুদ্ধে (৩—১)।

পরপর তিনবার কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির মুখোমুখি হল যুগোস্লাভিয়া। কিন্তু এবার পশ্চিম জার্মানি হেরে গেল এক গোলে। দ্রুত এবং দর্শনীয় ফুটবল খেলে যুগোস্লাভ ফুটবলাররা প্রশংসা কুড়ালেন। চিলির কাছে হেরে (০—১) যুগোস্লাভিয়া সেবারে চতুর্থ স্থান পায়।

১৯৭৪-এ পশ্চিম জার্মানিতে এসে প্রথম খেলায় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে তারা ড্র করল (০—০)। ব্রাজিল কোনোরকমে হার এড়াল। কিন্তু তৃতীয় খেলাতেও যুগোস্লাভিয়া স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জিততে পারল না (১—১)।

দ্বিতীয় রাউণ্ড লীগে অবশ্য যুগোস্লাভিয়া সমর্থকদের নিরাশ করল। পশ্চিম জার্মানি (২—০), পোল্যাণ্ড (২—১) এবং সুইডেন (২—১)—তিনটি দেশই যুগোস্লাভিয়াকে হারাল। আটাত্তরের বিশ্বকাপের চূড়ান্ত আসরে ওরা আসতেই পারেনি।

লেভ ইয়াসিন

সুইডেনে ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে প্রথম খেলতে আসে রাশিয়া। দলে দুর্দান্ত ফরোয়ার্ড সিমোনিয়ান। গোলে সর্বকালের সেরা ইয়াসিন। পুলের প্রথম ম্যাচে রাশিয়া-ইংল্যাণ্ড ২—২ করল। পুলের দ্বিতীয় ম্যাচে রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে হারাল ২—০ গোলে। কিন্তু শেষ ম্যাচে ভাভা, পেলে এবং গ্যারিঞ্চার ব্রাজিলের কাছে ০—২ গোলে হেরে যায়। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে প্লে-অফ ম্যাচে অবশ্য রাশিয়া কোনরকমে জিতল (১—০)।

কোয়ার্টার ফাইনালে সুইডেন সেবারে স্বদেশের মাটিতে অনায়াসে রাশিয়াকে হারিয়ে দিল (২—০)।

১৯৬২ সাল। প্রথম ম্যাচে যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়া জিতল ২—০ গোলে। এবারও দলে আছেন নেটো, ইভানভ এবং ইয়াসিন।

দ্বিতীয় ম্যাচে রাশিয়া উরুগুয়েকে হারাল কোনোরকমে (২—১)। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে রাশিয়া আরো খারাপ খেলল। কলম্বিয়ার সঙ্গে খেলার ফল হল ৪—৪।

কোয়ার্টার ফাইনালে চিলি অঘটন ঘটাল রাশিয়াকে হারিয়ে (২—১)। লেভ ইয়াসিন গোল খেলেন দুটি দূরপাল্লার শটে।

১৯৬৬ সালে প্রথম ম্যাচে রাশিয়ার কাছে উত্তর কোরিয়া হারল ১—৩ গোলে। দ্বিতীয় ম্যাচে শক্তিশালী ইতালিও হারল। একমাত্র গোলটি করলেন দুরন্ত উইঙ্গার চিসলেঙ্কো। চিলিকে হারিয়ে রাশিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল।

কোয়ার্টার ফাইনালে রাশিয়া হাঙ্গারিকে দাঁড়াতেই দিল না। রাশিয়া জিতল ২—১ গোলে।

সেমিফাইনালে রাশিয়া জার্মানির মুখোমুখি হল। উগ্র মেজাজের এই খেলায় রাশিয়া হারল ১—২ গোলে। স্মরণীয় খেলা খেললেন লেভ ইয়াসিন।

১৯৭০-এর বিশ্বকাপের উদ্বোধনী খেলায় রাশিয়া এবং মেক্সিকোর খেলায় কেউ গোল দিতে পারল না। দ্বিতীয় ম্যাচে হঠাৎ জ্বলে উঠে রাশিয়া বেলজিয়ামকে হারাল ৪—১ গোলে। পুলের শেষ ম্যাচে এল সালভাডরের বিরুদ্ধে রাশিয়া অনায়াসে জিতল (২—০)।

কোয়ার্টার ফাইনালে এক গোলমেলে গোলে উরুগুয়ে হারাল রাশিয়াকে।

১৯৭৪ এবং ১৯৭৮-এর বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে অবশ্য রাশিয়া আসতে পারেনি।

প্রধানত পাওয়ার ফুটবলের অনুগামী রাশিয়া বিশ্বকাপের ফাইনালে কখনও ওঠেনি। তবু একটা কথা যে-কোনো রুশ ফুটবল-প্রেমিক সগর্বে ভাবতে পারে ঃ পৃথিবীর যে-কোনো ফুটবল-মাঠে এগারো জনের মধ্যে একটি ছেলে তো গোলে দাঁড়াবেই। সেই খেলোটির স্বপ্নের মানুষ হয়ে থাকবেন একজনই —রাশিয়ার এক এবং অদ্বিতীয় লেভ ইয়াসিন।

বিশ্বকাপ ফুটবল / পশ্চাৎপট

এশিয়া • আফ্রিকা • ওশেনিয়া

বজ্রসেন

তারিখটা আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে সালটা আছে। ১৯৬৬। ইংল্যাণ্ডে বিশ্বকাপ-ফুটবল প্রতিযোগিতা চলছে। সকালের কাগজ দেখে লাফিয়ে উঠলাম। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল গ্রুপের খেলায় শক্তিশালী ইতালিকে এক গোলে হারিয়ে দিয়েছে উত্তর কোরিয়া, গোল করেছেন পাক ডু ইক। ফ্যাচেত্তি, রিভেরা, মাজোলার মতো দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় দিয়ে গড়া ইতালিকে সেবার ঐ হারের ফলেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হল। সেদিন এক অনাস্বাদিতপূর্ব গর্ব অনুভব করেছিলাম এই ভেবে যে, আমরা এশিয়াবাসীরাও পারি—অন্তত একবারের জন্যে হলেও—ইউরোপের উপরে যেতে। খর্বাকৃতি উত্তর কোরীয়রা রাতারাতি সারা এশিয়ার ফুটবল-অনুরাগীদের মাথা উঁচু করে দিয়েছিল সেদিন।

পরে কোয়ার্টার-ফাইনালে অবশ্য পর্তুগালের কাছে ৩—০ গোলে এগিয়ে থেকেও উত্তর কোরিয়ার কোনও লাভ হয়নি। ইউসেবিওর অনুপ্রেরণায় পর্তুগাল ঐ ম্যাচকে শেষ পর্যন্ত নিজের অনুকূলে ৫—৩ করে নেয়। কিন্তু সে-কথা যাক। সেই বছর বিশ্বকাপে উত্তর কোরীয়দের কীর্তির সুখ-স্মৃতি অনেক অনেক এশিয়াবাসী বহুদিন ধরে রোমন্থন করেছেন। আমি এখনও করি। হয়তো আরও দু-একজন করেন। যেমন, পাক ডু ইক এবং পাক সিউং জিন। শেষের জন পর্তুগালের বিরুদ্ধে প্রথম মিনিটেই এবং প্রাথমিক পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি গোল করেছিলেন।

দু বছর পরে মেক্সিকোতে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ফুটবলে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক পায় জাপান। প্রকৃত প্রস্তাবে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে ঐ স্থান তথা পদকই এশিয়ার একমাত্র প্রাপ্তি। শুধু এশিয়ার কেন, গোটা আফ্রো-এশীয় এলাকার। সেবার সমালোচকরা স্বীকার করেছিলেন যে, জাপানের কুনিসিগে কামামোতো যথার্থই বিশ্বমানের খেলোয়াড়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বসভায় এশিয়া উঁচু মাথা নিয়ে দাঁড়াল। নীল-জার্সি-পরা খর্বাকৃতি কিছু খেলোয়াড়ের দৌলতে।

জাপান অবশ্য ত্রিশের দশক থেকেই বড় ফুটবলে অংশ নিচ্ছে। ১৯৩৪-এর বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে কোয়ার্টার ফাইনালে সেবারের বিজয়ী ইতালির কাছে ০—৮ গোলে হারলেও আগের খেলায় সুইডেনকে ৩—২ গোলে হারিয়ে রীতিমত বিস্মিত করে দিয়েছিল ফুটবল-পণ্ডিতদের। সুইডেন ১৯২৪ অলিম্পিকের তৃতীয় স্থানাধিকারী, পরে ১৯৪৮-এ চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ১৯৫২-তে তৃতীয়; ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে রানার্স-আপ হয়। জাপানের কৃতিত্ব এইখানেই যে, মাত্র ১৯২১ সালে জাপানী ফুটবল সংস্থা নিপ্পন সুকুয়ু কিয়োকাই-এর প্রতিষ্ঠা। অবশ্য তার চার বছর আগেই জাপান দূর প্রাচ্য ফুটবল প্রতিযোগিতার সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছিল। মেলবোর্ন অলিম্পিকের প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলেও দুর্বল অস্ট্রেলিয়ান দলের কাছে জাপানকে হারতে হয়। এর পরের বারও জাপান চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তারা জার্মান কোচ ক্লেমারের শরণাপন্ন হয়। ক্লেমার ১৯৬০, ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৩-তে তিন দফায় প্রশিক্ষণ দিয়ে শুধু ভাল খেলোয়াড় নয়, ভাল কোচও তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন জাপানকে। আজ জাপানে সর্বত্র, এবং বিশেষত টোকিও, ওসাকা, ইয়োকোহামা, হিরোসিমা প্রভৃতি প্রধান জায়গাঁয় প্রাইমারি স্কুলের স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ফুটবলের আদর।

সুদীর্ঘ জাপানী শাসনের যুগে কোরিয়ার নিজস্ব ফুটবল দল গড়ে ওঠেনি, কিন্তু সেরা কোরীয় খেলোয়াড়রা জাপানের হয়ে খেলে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে প্রচুর। সুইডেনজয়ী জাপান দলেও কিছু কোরীয় খেলোয়াড় ছিল। ১৯৪৮-এ লণ্ডন অলিম্পিকে অংশ নিয়ে কোরিয়া মেক্সিকোকে হারায় ৫—৩ গোলে, কিন্তু সেবারের বিজয়ী সুইডেনের কাছে শোচনীয়ভাবে ০—১২ গোলে হেরে বিদায় নেয়। এরপর উত্তরে-দক্ষিণে ভাগ ও লড়াই। যাই হোক, রাশিয়ান কোচদের সহায়তায় দল তৈরি করতে থাকে উত্তর কোরিয়া। এবং ফল যে পায়, তা তো গোড়াতেই আমরা লক্ষ করেছি। দক্ষিণও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। অবশ্য এশিয়ান গেমসে একবার সরাসরি বিজয়ী ও একবার যুগ্ম-বিজয়ী হওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করতে পারেনি। ১৯৭০-এর বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় সিওলে সাব-গ্রুপের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দুবার ড্র করে (২—২, ১—১) এবং জাপানের সঙ্গে একবার জিতে (২—০) ও একবার ড্র (২—২) করে সাব-গ্রুপে দ্বিতীয় হয়। প্রথম হয়ে অস্ট্রেলিয়া ইজরায়েলের সাব-গ্রুপের বিজয়ী ইজরায়েলের সঙ্গে প্লে-অফ খেলে, জয়ী হয় ইজরায়েল। পরের প্রতিযোগিতায় এই ইজরায়েলকেই হারিয়ে দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া এশিয়া-ওশেনিয়া-গ্রুপের অন্যতম সাব-গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয় বটে, কিন্তু অপর দুই সাব-গ্রুপের বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া ও ইরানের সঙ্গে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠেনি। এশিয়া-ওশেনিয়া গ্রুপ থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। আশ্চর্যের কথা এই যে, ১৯৬৬-র মতো উদ্দীপ্ত খেলা উত্তর কোরিয়া আর খেলতে পারেনি। ১৯৭০-এ বিশ্বকাপে তারা যোগ দেয়নি। ১৯৭৪-এ দিয়েছিল, তবে দ্বিধাগ্রস্তভাবে, শেষ মুহূর্তে, কিন্তু তাদের সাব-গ্রুপে জয়ী হয়েছিল ইরান। লোকে বলতে লাগল, মিলিটারি ট্রেনিংয়ের গুণ আছে। এ-কথা বলার কারণ, ১৯৬৫-র উত্তর কোরীয় দলটি ছিল সামরিক অফিসারদের দল। আসলে বিভিন্ন দল থেকে সেরা খেলোয়াড়দের বেছে নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সেনাদলে এনে তাদের কড়া নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

জাপান ও কোরিয়ার কথা বলা হলেই বিশ্ব-ফুটবলে এশিয়ার গল্প একরকম ফুরিয়ে গেল বলা যায়। সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় ফুটবলের তুলনায় এশিয়া (এবং আফ্রিকা) অনেক পিছনে। ইউরোপের বাছাই একাদশের সঙ্গে এশিয়ার বাছাই একাদশের একটা খেলা হলেই এটা অক্ষরে-অক্ষরে প্রমাণিত হবে। ইউরোপের প্রধান-প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলির, যেমন ইউ-

ক'জন?

বিশ্ব-আসরে যখন এশিয়ার অবস্থাই এই, তখন সেখানে ভারতের স্থান যে কোথায়, তা সহজেই অনুমান করা যায়। জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন ভারতের ছিল হকিতে, ফুটবলে নয়। এখন হকিতে ভারত আগের তুলনায় অনেক হতমান, আবার ফুটবলের জগৎসভাতেও সে দর্শকমাত্র।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র চীন। বার্লিন ও লণ্ডন অলিম্পিকে সে অংশ নিয়েছিল। ফুটবলের চর্চাও যথেষ্ট। কিন্তু আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর মঞ্চ থেকে নিজেকে সে সরিয়ে রেখেছে। অন্যান্য এশীয় দেশগুলির মধ্যে ইরান, ইরাক, সিরিয়া,

ইতালির ফ্যাচেত্তির মাথা থেকে বল কেড়েছেন উত্তর-কোরিয়ানরা। কীভাবে তাঁরা দুর্ভেদ্য একটি দেওয়াল গড়ে তুলেছিলেন, দ্যাখো।

রোপীয়ান কাপ, ইউরোপীয়ান কাপ-উইনার্স কাপ, ওয়ার্ল্ড ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ, ইউরোপীয়ান ফেয়ার্স কাপ ইত্যাদির পাশে মালয়েশিয়ার মারডেকা, সিংগাপুরের পেস্তা-সুকান, থাইল্যাণ্ডের কিংস কাপ, সিওলের প্রেসিডেনট কাপ, ইন্দোনেশিয়ার মারা হালিম ইত্যাদি প্রতিযোগিতা অনেক নিষ্প্রভ। প্রথম ক্ষেত্রে বিজয়ী বা বিজিতদের মধ্যে থাকে রিয়েল মাদ্রিদ, সানটোস, ইণ্টারন্যাশনাল, মিলান, আজাক্স, আমস্টার্ডাম, বেনফিকা, বেয়ার্ন মিউনিখ, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, টটেনহাম হটস্পার-এর মত দল। এশিয়ান গেমস ফুটবলের মান ইউরোপীয়ান নেশনস কাপ-এর অনেক নীচে। স্ট্যানলি ম্যাথুজ, যোহান ক্রুইফ, লেভ ইয়াসিন, কোপা, ডি স্তেফানো, সুয়ারেজ, ববি চার্লটন, জর্জ বেস্ট, বেকেন-বাউয়ার, মুলার প্রমুখের পর্যায়ে আসতে পারেন এশিয়ার কুয়ায়েত, থাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, হংকং, মালয়েশিয়া, ইন্দো-নেশিয়া ও ইজরায়েল আজকাল বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। তবে এ-পর্যন্ত উত্তর কোরিয়ার মত কেউ কোয়ার্টার-ফাইনালে যেতে পারেনি। মেক্সিকোয় ইজরায়েল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল গ্রুপ লীগে গেলেও সবচেয়ে নীচে ছিল—উরুগুয়ের কাছে হেরে (০—২) এবং সুইডেন (১—১) ও ইতালির সঙ্গে (০—০) ড্র করে। ১৯৭৪-এর প্রতিযোগিতায় এশিয়া ও ওশে-নিয়া এক গ্রুপে ছিল, ইরান ও দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে বেশি পয়েণ্ট পেয়ে অস্ট্রেলিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এবারের প্রতিযোগিতায় আর্জেণ্টিনায় আফ্রো-এশীয় ভূখণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করছে টিউনিসিয়া এবং ইরান।

সুতরাং একটা কথা পরিষ্কার। ক্রমশই এশিয়ার বেশি সংখ্যক

বড় হয়ে ওঠার খুসীতে এই মেয়েটির মন ভরপুর। আপনার কন্যা ও পুত্র এই মেয়েটির মতোই নিশ্চিত যে তাদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, বিবাহ সব-কিছুরই সুব্যবস্থা আপনিই করবেন। সানন্দে এই দায়িত্ব পালন করতে এখন থেকেই আপনি উন্মুখ। তাই না?

আপনার পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ সুখী ও নিশ্চিত করতে আমাদের যে-কোন সঞ্চয় প্রকল্প থেকে আপনার সঞ্চয়ের আয় অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

ছোটরা সবাই এসো আমাদের রিচি রোড ও গড়িয়া শাখায় তোমাদের

চিলড্রেন্‌স কাউন্টার-এ

- নিজের নামে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলো, পাশবই নাও।
- নিজের নামে টাকা জমা দাও, নিজের সইতে টাকা তোলো।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ৭ রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোন : ২৩-৯৭৮৪ (৩টি লাইন)
চেয়ারম্যান জে. এন. বিশ্বাস

Progressive/UIB /78

দেশ ফুটবলের বিশ্বকাপে বা অপেশাদার অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছে, কিন্তু প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গেই তাদের খেলতে হচ্ছে, মূল প্রতিযোগিতায় হয় যেতে পারছে না কিংবা গেলেও সবচেয়ে কম পয়েণ্ট সংগ্রহ করে বিদায় নিচ্ছে। আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকালে এই সত্য সহজেই ধরা পড়ে।

বিশ্বরাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এশিয়ার অভ্যুদয়ের পাশাপাশি আফ্রিকার উত্থানও চমকপ্রদ। ১৯৫৭-র পর থেকে একের-পর-এক আফ্রিকান রাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। কিন্তু আজকের এই সব স্বাধীন রাষ্ট্র যে-সব ঔপনিবেশিক শক্তির অধীন ছিল, তারা আফ্রিকাকে কোনও দিক দিয়েই গড়ে তুলবার কোনও চেষ্টা করেনি, ফুটবলে যথোচিত তালিম দেওয়া তো দূরের কথা। তবুও আফ্রিকার নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অনেকেই ১৯৭০-এর প্রতিযোগিতাতে বিশ্বকাপ-ফুটবলে নিজ সাব-গ্রুপে অংশ নিল—মরক্কো, আলজিরিয়া, লিবিয়া, সিরিয়া, টিউনিসিয়া, সুদান, সেনেগাল, ঘানা, নাইজিরিয়া, জাম্বিয়া, ইথিওপিয়া ও ক্যামেরুন। মরক্কো প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে গেল পশ্চিম জার্মানির কাছে (১—২) ও পেরুর কাছে (০—৩) হেরে এবং বুলগারিয়ার সঙ্গে ড্র (১—১) করে গ্রুপের সবচেয়ে নীচে ছিল মরক্কো। পরের বার প্রাথমিক পর্যায়ে সিয়েরালিওন, গিনি, আইভরি কোস্ট, টোগো, দাহোমে, কেনিয়া, তানজানিয়া, জাইরে, কঙ্গো যোগ দেয়। মূল প্রতিযোগিতায় গিয়ে জাইরে তিনটি খেলাতেই যুগোস্লাভিয়া, ব্রাজিল ও স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে হেরে (০—৯, ০—৩, ০—২) বিদায় নেয়।

স্বাধীন মিশর বিশ্ব-ফুটবলে অংশ নিচ্ছে অনেক আগে থেকেই। ১৯২৪ সালে প্যারিস অলিম্পিকে ফুটবলে যোগ দিয়ে হাঙ্গারিকে ৩—০ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল মিশর। অবশ্য ১৯৩৪-এর বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় হাঙ্গারি তাদের ৪—২ গোলে হারিয়ে ঐ পরাজয়ের শোধ নেয়। সেইরকম শ্বেতাঙ্গ-শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকা এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে বহু বিদেশী দলের সঙ্গে খেলছে। এক সময় দক্ষিণ আফ্রিকার বহু খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ডে লীগে ও এফ এ কাপ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। এমনও দেখা গেছে যে, কোনও লীগ খেলায় ইংল্যাণ্ডের কোনও দলের হয়ে পাঁচজন দক্ষিণ আফ্রিকান খেলছে। প্রাইডে, ওলিন ফর্বেস, লিয়ারি, ফারমানি, পেরি, কেলি, স্টুয়ার্ট ইত্যাদি খেলোয়াড় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে খেলে অনেক যশ কুড়িয়েছিলেন। ইদানীং দক্ষিণ আফ্রিকা ফিফার স্বীকৃতি হারিয়েছে। বলা বাহুল্য, এর জন্যে দায়ী তাদের বর্ণবিদ্বেষী নীতি।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেটে এবং রাগবি ফুটবলে যে শক্তি ও খ্যাতির অধিকারী, অ্যাসোসিয়েশন ফুটবলে তার এক-শতাংশও না। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় "অস্ট্রেলিয়ান রুল" ফুটবলও জনপ্রিয়, যা রাগবি ও ফুটবলের এক জগাখিচুড়ি। এসব সত্ত্বেও এদুটি দেশ আজকাল নিয়মিত বিশ্বকাপে ও অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করছে। তবে উল্লেখযোগ্য ফল কেউই দেখাতে পারেনি। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, অলিম্পিক ফুটবলের মূল পর্যায়ে ভারতের একমাত্র জয়টি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ফুটবলের বিশ্বসভায় এশিয়া, আফ্রিকা ও ওশেনিয়ার দেশগুলিকে দীর্ঘদিন পিছনের সারিতেই বসে থাকতে হবে। এ-প্রতীক্ষা কতকাল চলবে তা কে জানে! তবে কোনও দেশের ক্রীড়ামানের পিছনে সেই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি যেমন কাজ করে, তেমনি কাজ করে খেলোয়াড়দের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও অভিজ্ঞতা। যে এখন সবে হামাগুড়ি দিচ্ছে, তার কাছ থেকে ম্যারাথন রেসের প্রথম পুরস্কার আশা করলে চলবে কেন?

বিশ্বকাপ ফুটবল

আমরা কেন যোগ দিই না

অমল দত্ত

নোন্‌তেদাকে আমিও ভয় করি। নোন্‌তেদার বাবা ছিলেন স্বনামখ্যাত অধ্যাপক। বাবা গত হতেই, প্রেসিডেন্সির ছাত্র নোন্‌তেদাকে কলেজের বদলে দেখতে পাওয়া গেল সারা রাতের গানের জলসায়, নামী-অনামী চিত্র-প্রদর্শনীতে এবং আধুনিক কবিদের আড্ডায়। সম্প্রতি নোন্‌তেদাকে খেলার মাঠেও দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু নোন্‌তেদাকে নয়, তার ছুঁড়ে-মারা প্রশ্নগুলিকেই এ-পাড়ার সকলে ভয় করে।

সেবার শারীরিক-সামর্থ্যের পরিমাপ-পরীক্ষারত, আমার একটা ছবি বেরোল আনন্দবাজারে। ঠিক তার পরের দিনই বগলে একটা বায়োকেমিস্ট্রির বই নিয়ে, নোন্‌তেদার আবির্ভাব।

"এই যে অমল, তোমাকেই খুঁজছিলাম। কার্ব-সাইক্লটা একটু বুঝিয়ে দাও তো! আচ্ছা এ টি পি'র রাসায়নিক ক্রিয়ায় আমাদের শরীরে যে এনার্জির রেডিয়েশন ঘটে, তার সঙ্গে ফস-ফোক্রিটিনের ক্রিয়াকাণ্ডটাই বা কী ধরনের?"

নোন্‌তেদার প্রশ্নের বিভিন্নমুখিতায় আমি যখন দিশে-হারা, সেজদার পোষা নেড়ি কুকুরটাই আমায় উদ্ধার করল। ও আবার বাইরের কাউকে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। নোন্‌তেদারও আবার কুকুরে ভীষণ ভয়।

কিন্তু এবার আমায় বাঁচাবে কে? টম তো গত বছর দেহ রেখেছে। আর নোন্‌তেদা যেরকম গ্যাঁট হয়ে বসেছেন, সহজে উঠবেন বলে তো মনেই হয় না। নোন্‌তেদা বলছিলেন, "এ-লাইনের কেষ্টবিষ্টু হয়েও তোমরা যদি এতবড় একটা 'ভাইটাল ইশু'কে এড়িয়ে যাও, বিশেষ করে এবারের বিশ্বকাপ-ফুটবলে হংকং, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরের মত পুঁচকে-পুঁচকে রাষ্ট্রগুলোও যখন লড়ে যাবার সাহস রাখে, তখন ষাট কোটির দেশ ভারতবর্ষ, বিশ্বকাপ-ফুটবলে যোগদানের কথা ভাবেই না বা আলোচনাও করে না, এটাই গভীর লজ্জার।"

যুক্তিগুলোর প্রতিবাদ না হওয়াতে নোন্‌তেদার মুখটা বেশ জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল। যাবার সময় পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, "তোমার তো আবার লেখাটেখার অভ্যাস আছে, এ নিয়ে একটা জুতসই আর্টিকল লিখে ফেল না।"

॥ ২ ॥

ভারতীয় ফুটবলের যে বিশ্বকাপে এখনও যোগদান করা উচিত নয়, এ সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করবার আগে তাবৎ দুনিয়ার ফুটবল-রসিকদের মানসিকতা, এই ফুটবলকে ঘিরে কীরকম উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে উঠছে, তারই সামান্য কিছুটা আলোচনা এখানে করে নিই।

অলিম্পিকের মত বয়সের ভার এই বিশ্বকাপ-ফুটবলের নেই। এ প্রতিযোগিতার শুরু ১৯৩০ সালে। কিন্তু জন্মের মাত্র কুড়ি বছর পরেই জনগণের মনে এমনই হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল যে, ১৯৫০ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ-প্রতিযোগিতার জন্য ব্রাজিলিয়ান সরকারকে একটা দৈত্যের আকারের স্টেডিয়াম তৈরি করতে হয়েছিল, যার দর্শক ধরবার ক্ষমতা—দু লক্ষ। পৃথিবীতে এর আগে কিংবা পরে আর কোন খেলার জন্য এত বড় স্টেডিয়াম তৈরি করবার দরকার হয়নি।

পৃথিবীর সব দেশেই পাথরের স্মৃতিমূর্তি তৈরি হয় শুধু সেই সব মানুষেরই, যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, কিংবা রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে দেশকে এগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালে হাঙ্গারির ফুটবল-রসিকরা যখন তাদের প্রিয় খেলোয়াড়দের পাথরের স্ট্যাচু বানাল এবং পরাজয়ের ক্ষোভে সেগুলোকে ভাঙল, তখন তাদের উগ্রতা ও অভিনবত্ব আমাদের চমকে দিলেও, ঘটনাটা ঘটেছিল।

১৯৭০ সালে, তিনবার বিশ্বজয়ী হবার পর প্রতিটি ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড় যখন গাড়ি, বাড়ি ও পঁচিশ হাজার পাউন্ড পুরস্কার পেল, তখন সবাই এটাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ৭৪ সালে, বিশ্বকাপ ফাইনাল সিরিজের খেলাগুলির আগেই হল্যান্ড ফুটবল-সংস্থা যখন ঘোষণা করল যে, হল্যান্ড স্রেফ ফাইনালে পৌঁছলেই, তাদের প্রতিটি খেলোয়াড় পাবে সাতাশ হাজার পাউন্ড, যার অপর নাম ইনসেনটিভ বোনাস, তখন ফুটবল-রসিকরা ধিক্কার দিয়ে বলল, হল্যান্ডের খেলোয়াড়রা স্রেফ টাকার লোভেই জান-প্রাণ দিয়ে এত ভাল খেলছে।

স্বভাবতই, এশিয়াবাসী হিসেবে আমাদের জানতে ইচ্ছা করে, এশিয়ার মত ফুটবলে অনুন্নত দেশের ছবিটা এ-বিষয়ে কী ধরনের?

রাষ্ট্র ও সংস্থা যদি এক উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়, তাহলে তার ফলাফল কী ধরনের হয়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—উত্তর কোরিয়া। সমাজতান্ত্রিক দেশ উত্তর কোরিয়া। তাই খেলোয়াড়দের টাকা দেবার প্রশ্নই ওঠে না। ১৯৬৩ থেকে ৬৬, সুদীর্ঘ তিন বছর ত্রিশজন খেলোয়াড়কে নিয়ে একটা ক্যাম্প করে উত্তর কোরীয় ফুটবল-সংস্থা। দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা অনুশীলন। রবিবারেও বিশ্রাম ছিল না। এই অসাধারণ ঘাম ঝরানোর ফল—উত্তর কোরিয়ার ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানো, যেখানে আজ পর্যন্ত এশিয়ার কোন দেশ এখনও পৌঁছতে পারেনি।

এবারের আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপে এশিয়া ও ওশেনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করবে—ইরান। উপরোক্ত দুটি গ্রুপে এবারের প্রতিযোগীর সংখ্যা—সতেরো। এইখানে এবং আরও আগে এগিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখেছেন আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ইরানের শাহ। এবং সে-স্বপ্নকে সফল করবার জন্য ইরানের ফুটবল-সংস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছেন তিনি।

পরে আরও খবর, ইরানের প্রতিটি খেলোয়াড় পাবে দশ হাজার পাউন্ড, যদি তারা ফাইনালে পৌঁছয়।

॥ ৩ ॥

উপরোক্ত বিবরণগুলো এটাই প্রমাণ করছে যে, টাকা অথবা দেশপ্রেম, যে-ভাবেই হোক খেলোয়াড়কে চরমভাবে প্রথমে উদ্বুদ্ধ এবং পরে সুদীর্ঘ দিন উপযুক্ত কোচের অধীনে অনুশীলনের সুযোগ করে না দিতে পারলে, বিশ্বকাপের মত চরম মানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা বাতুলতা। এবং এর সবটাই পুরো-

পুরি নির্ভর করে সফল নেতৃত্ব ও সুসংগঠিত সংস্থার ওপর।

নিখিল ভারতীয় ফুটবল-সংস্থার জন্ম ১৯৩০ সালে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এর কোন পাকাপোক্ত ঠিকানাই নেই। যিনি যখন সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন, তখন তাঁর বাড়ি কিংবা পকেটটাই এত বড় সংস্থার ঠিকানা হয়ে ওঠে।

এই সংস্থার আর্থিক অবস্থা এমনই নড়বড়ে যে, বড় ধরনের ক্যাম্প করা তো দূরের কথা, এক মাসের চলনসই ক্যাম্প করতেই রেস্ত ফুরিয়ে যায়।

ভারত সরকারের তরফ থেকেও এই বিষয়ের ওপর আজ পর্যন্ত কোন আলোচনা হয়নি।

এই প্রসঙ্গে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপে ভারত যোগদান করেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নাম তুলে নেওয়া হয়।

এর কারণ সম্পর্কে, সংস্থার তরফ থেকে বলা হয়েছিল, সরকার প্রতিশ্রুতি-মতো অর্থসাহায্য না করাতে আমরা নাম তুলে নিতে বাধ্য হলাম।

কয়েকমাস পরেই সরকারের তরফ থেকে বিবৃতি দেওয়া হল, সরকার প্রতিশ্রুতি-মতো টাকা ঠিকই রেখেছিলেন, কিন্তু সংস্থার তরফ থেকে সে-টাকা নেওয়া হয়নি।

প্রতিযোগিতায় যোগদান করা সকল খেলোয়াড়েরই কর্তব্য। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতার একটা সাধারণ মানে না পৌঁছে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে নিজেকে তো অপমান করা হয়ই, সেই সঙ্গে সেই প্রতিযোগিতাটাকেও নীচের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

কিন্তু আমি ভাবছি নোন্‌তেদার কথা। এ-লেখা ও'র হাতে পড়বেই। কিন্তু আমার সান্ত্বনা, আমি তখন বাঙলা দেশের বাইরে।

এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার
বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নের সঙ্গে
EXHAUSTIVE
QUESTIONS এ দেওয়া
প্রশ্নগুলি মিলিয়ে নিলে বোঝা যাবে
এ বইয়ের সার্থকতা কোথায় !

১৯৭৯ সালের পরীক্ষার্থীদের বই এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। দাম ১৫ টাকা। পুরো টাকা M.O. করলে রেজিস্ট্রী ডাকে বই পাঠানো হয়। অবশ্য বই ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই টাকা আসা চাই।

B. B. KUNDU & SONS
18L, TAMER LANE, CALCUTTA-700 009

সহজে ইংরেজি

চামেলি ও চম্বল

মিলিদের কথাবার্তা ততক্ষণ চলতে থাক, তার মধ্যে আমরা ওদের বিষয়ে কিছু বলে নিই। যা বলব, তার মধ্যে কিছু কথা তোমরা এর মধ্যেই জেনে গেছ, কিছু নতুন। যে কথাগুলো নতুন তার পাশে-পাশে একটা করে টিক মার্কা (✓) দিয়ে দাও।

Milly is a girl.
Milly is a pretty girl.
Milly is a seven-year-old girl.
Milly goes to school.
Milly has a cat.
Milly has a brown cat.
Milly has a brother.
Chambal is Milly's brother.
Chambal is eleven years old.
Chambal goes to school, too.

এ সবই হল জানানোর ব্যাপার। মিলি আরাবল্লিকে একটা কথা জানিয়েছিল, মনে আছে? সে নিজের কথা নিজেই জানিয়েছিল ঃ

I've (I have) got to go to school.

এ কথাটা এ-ভাবেও বলা যায় ঃ

I've (I have) to go to school.

আবার মিলির কথাটা আমরাও এভাবে জানাতে পারি ঃ

Milly has to go to school.

তেমনি, ওপরে মিলি আর চম্বলের সম্বন্ধে যা যা বলা হয়েছে, সে-কথাগুলো তারা নিজেরাও বলতে পারত। যেমন, মিলির কথা ঃ

I am a girl.
I am a pretty girl.
I am a seven-year-old girl.

কিংবা চম্বলের কথা ঃ

I go to school, too.

এইবার বাকি কথাগুলোও তোমরা এমনভাবে বদলে লেখো যেন যার কথা সে নিজেই বলছে।

একটা কথা এইবেলা বলে রাখি। চলতি কথায় অনেক সময়ে দুটো শব্দ মিলে একটা হয়ে যায়। আজকাল লিখবার সময়েও প্রায়ই ওইভাবে সংক্ষিপ্ত করেই লেখা আমরা দেখতে পাই। যেমন ঃ

I have (I've), you have (you've), I am (I'm), you are (you're), they are (they're), he is (he's).

অবশ্য সব সময়ে তা হয় না। যেমন ধরো, মিলি জোর দিয়ে বলছে, আমাকে ইশকুল যেতেই হবে, আর তার মা'ও তাতে সায় দিচ্ছেন।

Milly : I *have* to go to school.
Mother Yes, you *have* to, too.

মিলির মা সবশেষে যে শব্দটি ব্যবহার করলেন, তার কিন্তু বিশেষ কোন মানে নেই। কিন্তু ওই কথাটি এ-রকমভাবে প্রায়ই লাগানো হয়। এতে বোঝায়, মিলি ঠিকই বলেছে।

প্রসাদ

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ১ ॥

এর্নাকুলামের জাতীয় ফুটবল-আসর থেকে প্রচুর প্রাইজ নিয়ে ফিরে আসার পর কলেজে বন্ধুদের কাছে আমার কদর আরও বেড়ে গেল। রসিকতা করে এক বন্ধু বলল, "ভারত-রত্ন খেতাবের মত কলেজ-রত্ন প্রবর্তনের জন্য আমরা একটা প্রস্তাব আনব।" আমি বললুম, "সে-প্রস্তাব পাশ হলে মৌলিক চিন্তার জন্য খেতাব তো তুই-ই পাবি প্রথম।" অন্য বন্ধুরা বলল, "না রে বাবা, কথাতেও ওর সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না।" বললুম, "কথায় আর কাজ নেই, এখন ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা করো তো। প্রচুর খেটে খেলতে হয়েছে।" সত্যিই খাইয়েছিল। ওরা সেদিন আমাকে নানারকমের মিষ্টি খাওয়ায়।

প্রোফেসররা বললেন, "চুনী, আমরা খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু মনে রেখো, পড়াশুনো আগে। লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া চলবে না।" খাতির বাড়ল ক্লাবেও। কলেজে ও ক্লাবে ক'দিন বেশ হাল্কা মনে যাতায়াত করলুম। এরই মধ্যে আমার প্রথম বিদেশ সফরের সুযোগ এসে গেল। ওই ১৯৫৬ সালের গোড়াতেই।

আমার তো আনন্দের সীমাই ছিল না, আমাদের মোহন-বাগান ক্লাবের সব খেলোয়াড়ই খুশিতে টগবগ করতে লাগল। কারণ মোহনবাগান ক্লাব প্রথম বিদেশ সফরে যাচ্ছে।

আগে আই এফ এ দল বেশ কয়েকবার বিদেশ ঘুরে এসেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দু বছর আগে সফর করে এসেছে রুমানিয়া ও রাশিয়া। মোহনবাগান ক্লাবের এত প্রতিষ্ঠা, এত নাম, কিন্তু আগে কোনবার বিদেশে খেলতে যায়নি।

আমন্ত্রণ এসেছিল দূরপ্রাচ্য থেকে। তাই সফরটি মোহন-বাগান ক্লাবের 'প্রথম দূরপ্রাচ্য সফর' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। দূরপ্রাচ্য বললে অবশ্য অনেকগুলি দেশ বোঝায়। আমরা খেলতে গিয়েছিলুম ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ে।

আন্তর্জাতিক ম্যাচ এবং বিদেশের মাঠে বিদেশী দলের সঙ্গে খেলার মূল্য এবং অভিজ্ঞতা যে কতখানি, সেটা আমরা বুঝেছি খেলা থেকে প্রায় অবসর নেবার মুখে। অবসর নেবার পর কিন্তু আরও ভাল বুঝেছি অভিজ্ঞতা থেকে এবং বিদেশী কোচদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু আমাদের ঘরোয়া ফুটবল খেলে কোনো খেলোয়াড়ের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে ফুটে ওঠা সম্ভব নয়, সে যত ট্যালেন্টেড খেলোয়াড়ই হোক।

মাত্র সতেরো বছর বয়সে বিদেশ সফরের সেই সুযোগ আমার কাছে এসেছিল দৈব আশীর্বাদের মতো।

ছেলেবেলা থেকেই ফুটবল ছিল আমার সারাক্ষণের সঙ্গী, ধ্যানজ্ঞান। আস্তে-আস্তে দেখলুম সেই ফুটবল আমাকে কত সুযোগ দিচ্ছে। আজ এখানে, কাল ওখানে খেলছি। এক শহর থেকে ছুটে যাচ্ছি অন্য শহরে। প্লেনে চড়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছি। কত নতুন বন্ধু পাচ্ছি, দেখছি নতুন নতুন দেশ। সেই দেশের মানুষের আচার-ব্যবহার, তাদের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজজীবন, জীবনযাপনের ধারা। শুনছি কত নতুন ভাষা। আমাদের বিশাল দেশ ভারতবর্ষে নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের সমন্বয় ঘটলেও বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতাই পৃথক। তার মূল্যও আলাদা। বিদেশ সফর তো শিক্ষারও অঙ্গ। আমি অবশ্য কতটুকুই বা শিখেছি। শিক্ষা তো অসম্পূর্ণই থেকে গেছে। তবু—বড়দের কাছে নয়—তোমাদের কাছে বলছি, যদি সামান্য কিছুও শিখে থাকি, সেটুকু শিখেছি খেলতে-খেলতেই।

এখন সফরের কথা বলা যাক। গোছগাছ করার আগে একটা কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৫০ সালে ভারতের একটি দল গিয়েছিল দূরপ্রাচ্য সফরে। বলাইদা ছিলেন সেই দলের কোচ। বাড়ি থেকে যাত্রার আগে আমি বলাইদার বাক্স বিছানা গুছিয়ে দিয়েছিলুম, আর কৌতূহলী হয়ে নানা প্রশ্ন করছিলুম। আমার বয়স তখন এগারো বছর। মনে হচ্ছিল বলাইদার সঙ্গে চলে যাই। বোধহয় আমার মনমরা ভাবটা লক্ষ করে তিনি বললেন, "এত ভাবছ কেন? ঘাবড়াবার কিছু নেই। তুমিও তো একদিন বিদেশে যাবে। সেদিন এইভাবেই আমি তোমার বেডিং সুটকেশ জামাকাপড় গুছিয়ে দেব।" খেলোয়াড় চেনার ব্যাপারে বলাইদার ছিল ষষ্ঠেন্দ্রিয়। শুধু আমার বেলাতেই নয়, অনেকের গায়েই কল্পনার কালিতে তিনি লিখে দিয়েছিলেন 'ভারত দলের ভবিষ্যৎ খেলোয়াড়'।

আমার যাত্রার সময় অবশ্য বলাইদা উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সেই কথাটিই বার বার মনে পড়ছিল, "তুমিও একদিন বিদেশে যাবে।"

বলাইদা উপস্থিত থাকলে আমার কীই বা গুছিয়ে দিতেন? জামা প্যান্ট তো বেশি ছিল না। বাবাকে অনেকগুলি মুখে অন্ন জোগাতে হত। আমাদের লেখাপড়ার খরচ ছিল। একসঙ্গে দুটি

হংকংয়ে, ডাসমাল রেস্তোরাঁয়

জামার বেশি তৃতীয়টি জোটেনি। আমার বেশ মনে আছে, যাবার আগে মোহনবাগান ক্লাব থেকে আমরা পেয়েছিলুম একটি ব্লেজার ও একটি উরস্টেড ট্রাউজার। তাতেই আমার কী আনন্দ। মাত্র দুটি শার্ট, দুটি ট্রাউজার ও একটি ব্লেজার নিয়ে বের হলুম বিদেশে। তাও শীতকালে, মাসখানেকের সফরে।

কারা আমাদের দলে ছিল দ্যাখো। **গোলকীপার**—এস চ্যাটার্জী ও আর গুহ। **ব্যাক**—শৈলেন মান্না (অধিনায়ক), পি বড়ুয়া ও সুশীল গুহ। **হাফ ব্যাক**—রতন সেন, শুভাশিস গুহ, নারসিয়া, পরিমল মজুমদার, চন্দন সিং ও দুলাল মুখার্জী (পরিমল, চন্দন সিং ও দুলাল প্রথমে আমাদের সঙ্গে যায়নি। কলকাতার খেলোয়াড়দের দল-বদলের পালা চুকিয়ে তারপরে যায়)।

ফরোয়ার্ড—পি কে ব্যানার্জী, এস ব্যানার্জী, কেষ্ট পাল, **চুনী গোস্বামী, সত্তার, রামন ও কেষ্ট দত্ত।**

ম্যানেজার হয়ে গিয়েছিলেন দুজন। ধীরেনদার দাদা তখনকার বিখ্যাত ক্রীড়া-প্রশাসক শৈলেন দে এবং অতীতের খ্যাতনামা খেলোয়াড় করুণা ভট্টাচার্য। শৈলেনদা অনেকদিন আগে পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটিয়ে পরপারে চলে গেছেন। তাঁর সম্বন্ধে তোমরা হয়তো কিছুই জানো না। বিরাট হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। আর খেলার সংগঠনে ছিলেন সিদ্ধকর্মা পুরুষ। এখন অফিস স্পোর্টস ফেডারেশনে কত অফিস ক্লাবই তো খেলছে। এই ফেডারেশন তাঁরই সৃষ্টি। ক্যালকাটা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকরূপে এবং সভাপতি হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। সংগঠন-শক্তির বড় পরিচয় দিয়েছিলেন সি এ বি-র সম্পাদক হয়ে। খেলোয়াড় হিসাবে করুণা ভট্টাচার্যের খ্যাতির কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। ১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী আই এফ এ দলের উনিই ছিলেন অধিনায়ক। সুতরাং বিদেশে আমরা ছিলুম দুই পর্বতের আড়ালে। গায়ে আমাদের আঁচটি লাগেনি।

হ্যাঁ, পি কে ব্যানার্জীকে কেন নেওয়া হয়েছিল? পি কে তো মোহনবাগানের খেলোয়াড় ছিলেন না। রাইট আউট ভেঙ্কটেশের তখন ফর্ম ভাল ছিল না। বয়সও হয়েছিল। তাই প্রথম বিদেশ সফরে দলকে শক্তিশালী করার জন্যই পি কে'কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

পি কে'র কথাতে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার মত পি কে'ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তখন ওরও বোধহয় দুটির বেশি শার্ট ছিল না। যাবার দিন হল কী, দমদম এয়ারপোর্টে যাবার পথে ফাউন্টেন পেনের কালি লিক করে পি কে'র শার্টের বুক-পকেটটি ভিজে একেবারে কালো হয়ে গেল। ওই অবস্থায় প্লেনে চাপা একটা বিশ্রী ব্যাপার। কিন্তু উপায় ছিল না। সফর শুরু না হতেই সম্বল মাত্র দুটি শার্টের আর-একটি কি ভাঁজ ভেঙে পরা যায়?

দমদম থেকে আমরা যাত্রা করেছিলুম ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারওয়েজের বিমানে। ডায়েরিতে দেখছি তারিখটা ছিল ১৯৫৬-র ২২ ফেব্রুয়ারি। ব্যবস্থা ছিল—দমদম থেকে রেঙ্গুন, রেঙ্গুন থেকে ব্যাংকক। সেখানে রাত কাটিয়ে পরের দিন যাব সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুরে আবার রাত্রিবাস। পরদিন ইন্দোনেশিয়ায়।

দমদম থেকে উড়তে শুরু করে ৩ ঘণ্টায় প্রায় সাড়ে সাতশো মাইল পাড়ি দিয়ে মহাশূন্য থেকে বিমানখানি আমাদের নামিয়ে দিল রেঙ্গুনের মাটিতে। মিনিট ৪৫ পরে আবার উড়তে আরম্ভ করে রাত সাড়ে বারোটায় ব্যাংককে পেঁছিলুম। জানো বোধহয়, ব্যাংকক হচ্ছে তাইল্যাণ্ডের রাজধানী। আগে এই দেশটাকে বলা হত শ্যামদেশ। পরের দিন ব্যাংকক থেকে সিঙ্গাপুর পেঁছে গেলুম ঘণ্টা চারেক উড়ে। আজব শহর এই সিঙ্গাপুর। হরেকরকম জাতির মানুষের বাস। চীনারাই বেশি। প্রাচুর্য যেন উপচে পড়ছে। বিদেশী পণ্যের পসরা সারা শহরময়। আর শুধু মোটরগাড়ি আর মোটরগাড়ি। ট্যাক্স-ফ্রি টাউন সিঙ্গাপুর। শুল্ক দিতে হয় না বলে ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো। পৃথিবীর নানা দেশের বড়-বড় ব্যবসায়ীর আস্তা এখানে। সৌন্দর্য আর বিলাস-সামগ্রীর সম্ভারে মনে হয় যেন স্বপ্নপুরী।

আমরা উঠেছিলুম ক্যাথে প্যাসিফিক হোটেলে। বিমান কোম্পানির সঙ্গে হোটেলটির সম্পর্ক থাকতে পারে। অন্তত নামে ও আকৃতিতে তাই মনে হয়েছিল। হোটেলটিও যেন মহাশূন্যে মাথা বাড়াতে চাইছে। তখন কলকাতায় সাত-আটতলা বাড়ির সংখ্যা বেশি ছিল না। তার বেশি তলা বাড়ির দিকে আমরা বিস্ময়ে তাকাতাম। সিঙ্গাপুরের ক্যাথে প্যাসিফিক হোটেলটি ২২ তলা। নীচে থেকে উপরে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে পারছিলুম না, ওই হোটেলেই আমাদের থাকতে হবে। পাঁচ-তারা ওই হোটেলে আরাম উপকরণেরই বা কী বাহার। আমাকে ও পি কে'কে দুই বেডের একটি ঘর দেওয়া হয়েছিল। সেখানে থাকব কী, ঘরের আসবাবপত্র এবং আরামের ব্যবস্থাদি দেখে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। কতরকমের ফিটিংস। আজ লিখতে একটু লজ্জাই হচ্ছে। তখন তো খুব চটপটে ছিলুম না। কোন্ সুইচটা টিপলে কোন আলোটা জ্বলবে, কোনটা টানলে পর্দা সরবে, কোন সুইচে বেল বাজবে, বাথরুমের কোন্ ট্যাপ খুললে শাওয়ার থেকে জল পড়বে, কোন্‌টা থেকে আসবে ঠাণ্ডা বা গরম জল—এ সবের হদিস পেতে আমাদের আধঘণ্টা কেটে গিয়েছিল। আমি আর পি কে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিলুম আর হাসাহাসি করছিলুম এটা-ওটা পরীক্ষা করতে করতে। মজাও লাগছিল মন্দ নয়। আনন্দ পাচ্ছিলুম এই ভেবে যে, ইন্দোনেশিয়া থেকে এই সিঙ্গাপুরেই আবার ফিরে আসতে হবে খেলার জন্য।

পরের দিন আমাদের গন্তব্যস্থান ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের মিডান শহর। সকালে বিমানবন্দরে পেঁছে দেখি "গরুড়-পক্ষী" প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছে। গরুড়-পক্ষী মানে ইন্দোনেশিয়ার গরুড় এয়ারওয়েজের বিমান। বিমানের গায়ে মস্ত গরুড়-পাখির ছাপ। শুধু ডানা মেলার অপেক্ষা।

(ক্রমশ)

ফুটবল-শব্দসন্ধানের সমাধান

১ব	স	২জি	ক		৩ক্রু		৪মু	
বি		মি		৫উ	ই	শি	লা	র
চা		গ্রি			ফ		র	
র্ল		ভ্						৬জা
৭ট	ম	স	ন		৮ডে	৯নি	স	ল
ন				১০টো		স		মা
		১১ফ্যা		স্টা		কে		স্যা
১২ই	উ	সে	বি	ও		ন		ণ্টো
		তি			১৩পু	স	কা	স

টিকিটা কোন দিকে কুন্তক

টুম্পিকে ডেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করিঃ ট্রামের টিকিটা কোন্ দিকে থাকে বলতে পারিস ?

টিকিট ?

টিকিট নয়, টিকিট নয়, টিকি।

ট্রামের আবার টিকি কোথায় ?

টিকি নয় তো কী ? ওই যে ইলেকট্রিক তারের সঙ্গে গেঁথে রাখে ট্রামটাকে, দেখিসনি যেটা মাঝে-মাঝে খসে পড়ে আর থেমে যায় ট্রাম ?

ও ! ওইটা। ওটা থাকে পিছনের দিকে, মানে সেকেণ্ড ক্লাসে।

নন্তু বলল ঃ মোটেই না, সামনের দিকে, ফার্স্ট ক্লাসে।

এই দাদা, আমি স্পষ্ট দেখেছি, সেকেণ্ড ক্লাস।

আমি কি অস্পষ্ট দেখেছি না কি ? কিন্তু টুম্পি, সেটা কোনো কথা নয়। আমি ভাবছি কাকুর আসল মতলবটা কী। ট্রামের টিকি সামনে না পিছনে, এ তো নিশ্চয় কাকুর সমস্যা নয় কোনো। কোন্ শব্দের বানান নিয়ে ভাবছে কাকু, সেই হল কথা। বলে ফেলো তো ব্যাপারটা।

খুব মাতব্বর হয়েছিস দেখছি। ঘুরছে একটা শব্দ, ঠিকই। কিন্তু আগে বলে নিই, তোরা দুজনেই ঠিক দেখেছিস। ট্রামের টিকি সামনেও হয়, পিছনেও হয়।

টুম্পি বলে ঃ তাই বুঝি ?

ঠিক আছে। এইবার শব্দের টিকি কোন্‌টা বলো।

শব্দের টিকি নিশ্চয় রেফ ? তাই না ? রেফের কথাই বলবে তো তুমি ?

হ্যাঁ, রেফের কথাই বলব। অনেকেই দেখবি রেফটাকে কিছুতেই জায়গামতো সামলাতে পারে না। পরের শব্দের রেফ আগের শব্দের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, একেবারে এর মুণ্ডুতে ওর টিকি।

সে কী রকম দুটো শব্দের কথা হচ্ছে না কি এখানে ?

অনেক সময়ে দুটো শব্দ জোড় বেঁধে একটা শব্দ হয়ে যায় না ? সেইরকম শব্দের কথা বলছি। ধর, বাইরের জগৎ, এটাকে একটু ঘন করে নিয়ে কী ভাবে বলা যায় ?

বাইরের জগৎ ? বহির্জগৎ।

লিখে দেখা তো।

নন্তু চটপট করে লিখে আনল খাতায়। আর সঙ্গে-সঙ্গে ধরা পড়ল গোলমালটা। যা ভাবা গিয়েছিল, তাই। নন্তু লিখেছেঃ বর্হিজগৎ।

এই দেখ, কী লিখেছিস, বর্হি। বর্হি কোথায় পেলি ?

এ মা ! কী শব্দ বানিয়েছে দাদা। বর্হি ! এ আবার কোনো শব্দ হয় না কি ?

নন্তু চোখ পাকিয়ে বলে ঃ লিখতে গেলে তোমারও হতো। বাজে বোকো না। আর তাছাড়া, বর্হি না হোক বর্হ তো হয়।

বর্হ ?—আমিই একটু অবাক হয়ে পড়ি এবারঃ বাংলায় কেউ বর্হ লিখতে পারে কখনো ?

ঝিমিয়ে-পড়া নন্তু এবার ঝাঁপিয়ে উঠল দশ হাত ঃ এইবার হেরে গেছ কাকু। রবীন্দ্রনাথ পড়েনি কাকু। লেখেননি রবীন্দ্রনাথ ? পড়োনি

কর্ণ হতে বর্হ খুলি স্নেহহাস্য ভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া 'পরে।

পড়োনি ? চৈতালিতে ?

লজ্জাই পেতে হল একটু। বলি ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বটে। তবে, সে তো কালিদাস নিয়ে লিখেছিলেন বলে আস্ত সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তা কবিতা বলায় তুমি তো বাপু ফুল মার্কস, বানানের বেলায় এরকম কেন ?

বানানটা উঠে যাচ্ছে তো, সেইজন্যে।

মানে ?

মানে জানো না তুমি ? পণ্ডিতেরা বলছেন এত সব ঝামেলার দরকারই হবে না পরে। যে যা লিখবে সেটাই হবে ঠিক। দুটো ন থাকবে না, দুটো জ থাকবে না, তিনটে শ থাকবে না, থাকবে না দুটো ই বা দুটো উ, বিসর্গ থাকবে না। আর, যুক্তাক্ষরই থাকবে না মোটে, তার আবার রেফ ! শোনোনি এসব ?

শুনেছি। সে তো আরো শুনেছি, একদিন পৃথিবীই থাকবে না, কেননা সূর্য নাকি আস্তে-আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু যতদিন সেটা না হচ্ছে, ততদিন একটু শিখে রাখা ভাল। ততদিন পর্যন্ত অন্তর্জ্বালার রেফটা জ-এর উপরে থাকাই ভাল। ততদিন পর্যন্ত বহির্মুখী বহির্মণ্ডলকে বর্হির্মুখী বর্হির্মণ্ডল লেখা চলবে না, চতুর্দিককে চর্তুদিক কিংবা অন্তর্মুখী অন্তর্গূঢ়কে অর্ন্ত—

অর্ন্ত ? উরেব্বাবা। ও তো উচ্চারণই করা যায় না।

ওইটেই তো মজা। যে লিখছে সে তো আর ওভাবে উচ্চারণ করছে না। লেখার সময়ে মনটা যে ভালরকম কাজ করছে না, এতে কেবল এইটেই বোঝা যায়। চোখ দেখছে শব্দকে, কান শুনছে শব্দকে, মন ভাবছে শব্দকে। একই শব্দের আছে একটা ছবি, একটা ধ্বনি, আর তাকে নিয়ে একটা ভাবনা। এই সবকটাকে তো মেলাতে হবে একসঙ্গে ?

এত মেলানো শক্ত কিন্তু। তার চেয়ে বর্তমানে আমি মানে-মানে পালাই।

ওর কী মানে হল ?

মানে হল, বর্তমান। এর টিকিটাকেও সেকেণ্ড ক্লাসে চালিয়ে দিলাম।

ফাজলামো ? ধর্ তো টুম্পি ওর টিকিটাকে চেপে।

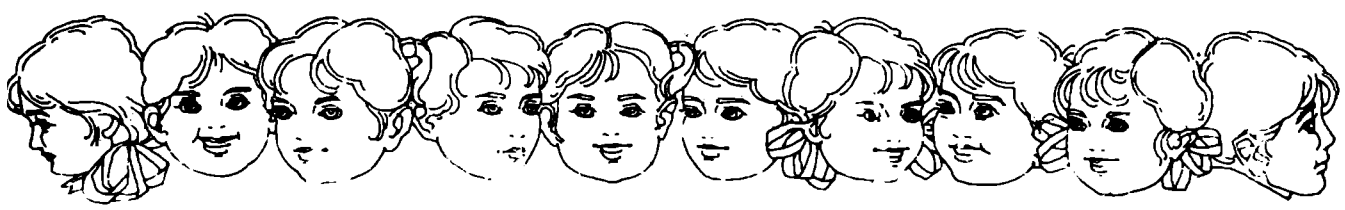

উপন্যাস

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

সমরেশ বসু

আগে যা ঘটেছে

দুদিন আগে গোগোল বিকেলে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে, মায়ের কাছে ডাবুদার হারিয়ে যাবার খবর শোনে। তার পরেই ঘটনার শুরু। ডাবু গোগোলের থেকে বড়, ক্লাশ এইটে পড়ে, আর গোগোলদের একই বিল্ডিংয়ের আটতলায় থাকে। দুদিন আগে, সকালে ডাবুদা খেয়ে ইস্কুলে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। পাড়ায় অনেকেই তাকে বখাটে বলে। সে তার থেকে বয়সে বড় লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করত। ডাবুদার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় গোটা পাড়া ও বিল্ডিংয়েই রীতিমত হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছিল। পুলিসের আনাগোনা, ভারতবর্ষের নানাদিকে খবর দেওয়া, আর গোয়েন্দা পুলিসের খোঁজখবর, সব মিলিয়ে হৈ-চৈ কাণ্ড। গোগোল আর ওর বন্ধুদের উত্তেজনাও কম ছিল না। এই অবস্থায় প্রথম দিনেই, গোগোল ছ' তলার মহেশানিদের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার ভিতর থেকে অদ্ভুত সব শব্দ শুনতে পেয়েছিল, যা মানুষে ছাড়া করতে পারে না, অথচ বেল টিপেও কারো পাত্তা পাওয়া যায়নি। পরে অবশ্য ওর মনে পড়েছিল, মহেশানিরা সবাই দিল্লি চলে গিয়েছেন তাঁদের কাজের লোক চান্দা সিং ছাড়া। কিন্তু ফ্ল্যাটের মধ্যে শব্দ কিসের, চান্দা সিংই বা কোথায়? তা ছাড়া আর-একটা অচেনা লোককেও গোগোল বিল্ডিংয়ের নানা ফ্লোরে কেমন যেন সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিল। পরে জেনেছিল, লোকটা নাকি চান্দা সিংয়ের মামা। অথচ দু ঘণ্টা ধরে লোকটা মহেশানিদের ফ্ল্যাট কেন খুঁজে পাচ্ছিল না! পরের দিনই জানা গিয়েছিল, ডাবুদাকে ডাকাতরা চুরি করেছে, আর টেলিফোন করে পঞ্চাশ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে। খবর শুনেই গোগোলের মাথা খারাপ। ইস্কুলে গিয়ে ভাল করে পড়াও করতে পারেনি। বিকেলে বাড়ি ফিরে ও আবার মহেশানিদের বন্ধ দরজার ফ্ল্যাটের চাবির ছিদ্রে উঁকি দিয়েই, ভিতরে যেন ডাবুদাকে দেখতে পেয়েছিল। তাও কি সম্ভব? ভেবে আর একবার দেখতে যেতেই, ফ্ল্যাটের দরজা হঠাৎ খুলে গিয়েছিল, আর গোগোলকে পর্দার আড়াল থেকে দুটো হাত ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ওর হাত-পা-মুখ বাঁধা হয়েছিল, আর ও দেখেছিল চান্দা সিং আর তার মামাই আসল ডাকাত। ডাবুদার দেখাও সেখানে পেয়েছিল। ডাবুদা গোগোলকে চোখ টিপে, দু-একটা কথা বলে জানিয়ে দিয়েছিল, পালাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ডাবুদার হাত থেকে দুধ খাবার পরেই গোগোল অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। ডাবুদার ডাকেই ওর ঘুম ভাঙল। দেখা গেল, একটা খোলা ট্রাকের পিছনে ও হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে। ডাবুদা চুপি-চুপি বলল, "যা বলছি ভাল করে শোন্। সময় বেশি হাতে নেই।" তারপর—

॥ ১৩ ॥

ডাবুদা প্রথমেই গোগোলের মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, "একটা কথাও জোরে বলিস না।"

গোগোল ফিসফিস করে বলল, "ডাবুদা, তোমার হাতে দুধ খেয়ে আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এই ট্রাকে এলাম কী করে?"

ডাবুদা কানের কাছে মুখ রেখে বলল, "কী করে এলি, তুই জানবি কী করে? তোকে তো একটা বস্তায় পুরে ট্রাকে তোলা হয়েছিল। তোর তখন কোন জ্ঞান ছিল না।"

ডাবুদার কথাগুলো শুনে গোগোলের গায়ের মধ্যে শিউরে উঠল। বস্তায় পুরে ওকে ট্রাকে তোলা হয়েছিল? অথচ ওর জ্ঞান ছিল না? এ তো বইয়ে পড়া ডাকাতদের গল্পের মতোই সাংঘাতিক! ও অবাক হয়ে চুপিচুপি গলায় বলল, "আমাকে বস্তায় পুরেছিল, অথচ আমার জ্ঞান ছিল না?"

ডাবুদা বলল, "কী করে থাকবে? তোকে আমি যে-দুধটা খাইয়েছিলাম, তার মধ্যে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল।"

গোগোল এখন বুঝতে পারল, ডাবুদার কাছ থেকে দুধ খেতে-খেতেই কেন ওর দু-চোখ ঘুমে জুড়ে আসছিল। ডাকাতদের কথায় ডাবুদা এরকম কাজ করতে পারে ভেবে, ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বলল, "ডাবুদা, ওদের কথায় তুমি আমাকে ওষুধ-মেশানো দুধ খাইয়ে দিলে?"

ডাবুদা বলল, "হ্যাঁ। তুই তো চান্দা সিংয়ের হাত থেকে দুধের গেলাস ফেলে দিয়েছিলি। তাই ওরা আমাকে দিয়েছিল। আর আমি যদি তোকে সেই দুধ না খাওয়াতাম, তা হলে ওরা আমাকে বিশ্বাস করত না। আসলে ওটা তো বিষ ছিল না, গাঢ় ঘুমের ওষুধ ছিল। ওটা তোকে খাওয়ানো হয়েছিল। যাতে তোকে বস্তায় পুরে ট্রাকে তুলে নেওয়া যায়।"

গোগোল নিজেকে বস্তায়-পোরা অবস্থায় ভাবতেই যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বলল, "আমার যদি দম বন্ধ হয়ে যেত?"

ডাবুদা বলল, "দূর বোকা। কী করে বস্তায় পুরলে দম বন্ধ হবে না, সে-সব চান্দা সিংরা ভালই জানে। আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছিলাম। ওরা যদি আমাদের ওই ফ্ল্যাট থেকে বের করে না আনতে পারত, তা হলে তোর-আর আমার কপালে কী ঘটত কিছুই বলা যায় না। তোকে তো আগেই বলেছি, ওরা করতে পারে না, এমন কাজ নেই। সেইজন্য তখন আমি ওদের সব কথাই শুনেছি।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে ওরা ট্রাকে তুলল কী করে?"

ডাবুদা বলল, "আমি নিজে-নিজেই উঠেছি। আমার মাথায় একটা পাগড়ি বেঁধে দিয়েছিল, আর জৈল সিংয়ের মতো একটা গোঁফ লাগিয়ে দিয়েছিল। ট্রাউজারের বদলে পরিয়ে দিয়েছিল একটা ডোরাকাটা পায়জামা আর পাঞ্জাবি। আমাদের বিল্ডিংয়ের দরোয়ান সমসের সিং আমাকে দেখে মোটেই চিনতে পারেনি।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "ট্রাকটা কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল?"

ডাবুদা বলল, "কেন, আমাদের বিল্ডিংয়ের চত্বরেই। তুই ভাবছিস, কেউ কোন সন্দেহ করেনি কেন? কেনই বা করবে? চান্দা সিংকে তো সবাই চেনে। ও সবাইকে বলেছে, দিল্লি থেকে মহেশানিরা খবর দিয়েছে, বাড়ির কিছু মালপত্র এক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। ওকে কারো অবিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না। তাছাড়া, পুলিস ভাবতেই পারেনি, আমাকে, তারপরে তোকে ওই বিল্ডিংয়েই রাখা হয়েছে। এমন কী, বিল্ডিংয়ের কেউ-কেউ ট্রাকটা দেখেছে, চান্দা আর জৈল সিংকেও দেখেছে, কেউ কিছু সন্দেহ করেনি। চান্দা আর জৈল সব প্ল্যান মাফিক করেছে। ওরা তোকে আর আমাকে নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে পালাবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।"

গোগোল অস্থির আর অবাক হয়ে বলল, "তবু তুমি ট্রাকে ওঠার সময় চিৎকার করে সবাইকে ডেকে সব ভেস্তে দিতে পারলে না?"

ডাবু এবার যেন একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "তুই তো আচ্ছা বোকা! বারবার বলছি, ওরা খুব সাংঘাতিক লোক। আমি যদি তখন চিৎকার চেঁচামেচি করে একটা কাণ্ড করে ফেলতাম, তাহলে তোকে আমাকে আর বেঁচে থাকতে হত না। যা করতে হবে, ধীরেসুস্থে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে করতে হবে। ট্রাকে ওঠবার আগেই আমি সব ভেবে রেখেছি। ট্রাক ছাড়বার পরেই তোকে বস্তার ভেতর থেকে বের করে হাত-পা-মুখ-বাঁধা অবস্থায় এখানে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। আর আমি বসেছিলাম সামনে। ওদের

কথা থেকে বুঝেছি, বম্বে রোড দিয়ে গেলেও পরে ওরা রাঁচির দিকে যাবার রাস্তা ধরবে, আর সেখান থেকে জঙ্গলে কোথাও আস্তানা গাড়বে। এখন রাত বেশি হয়নি, এগারোটা বাজে। আমি তোর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিচ্ছি, কিন্তু দড়িগুলো জড়ানোই থাকবে। যেই দেখবি কোথাও গাড়িটার স্পীড কমে গেছে, বা থেমেছে, তুই চট করে পেছন দিয়ে নেমে, রাস্তার ধারে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়বি। এ রাস্তায় সারা রাত গাড়ি চলে। কলকাতার দিকে একটা গাড়িতে যদি চেপে বসতে পারিস, তা হলে তো কোন কথাই নেই। মোটের ওপর প্রাণে বেঁচে ওদের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে এই প্ল্যান ছাড়া উপায় নেই। এখন সবই তোর ওপর নির্ভর করছে।" এই কথা বলেই ডাবুদা গোগোলের হাত-পায়ের দড়ির বাঁধন খুলতে লাগল।

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "ডাবুদা, তুমি কি ওদের সঙ্গে সামনেই বসবে?

ডাবু বলল, "হ্যাঁ। ওরাই আমাকে দেখতে পাঠিয়েছে, তোর জ্ঞান হয়েছে কি না। আমি গিয়ে বলব, তোর এখনো জ্ঞান ফেরেনি সেইজন্য আমার মন খুব খারাপ লাগছে। আর শোন, হাত পা খুলে দিলাম, আর এই কাগজের টুকরোটা তোর পকেটে রেখে দিলাম। এতে ট্রাকের নকল আর আসল দুটো নম্বরই লেখা আছে। রাঁচি আর জঙ্গলও লিখে দিয়েছি।"

গোগোল এতক্ষণে দড়ির শক্ত বাঁধন থেকে খোলা পেয়ে আরাম বোধ করছিল। কিন্তু ও হাত-পা নাড়ল না, যেমন পড়ে ছিল, তেমনি রইল। বলল, "ডাবুদা, তুমি কী করে এদের খপ্পরে পড়লে, তা তো বললে না।

ডাবুদা বলল, "যেমন কর্ম তেমনি ফল, একটা কথা আছে না। আমার সেই অবস্থা হয়েছে। আমি অনেক বাজে লোকের সঙ্গে মিশে, সত্যি বাজে হয়ে গেছি, আর তারই শাস্তি পাচ্ছি। আসলে চান্দা সিংয়ের মাথায় প্রথম প্ল্যানটা আসে। আমাকে লুকিয়ে রেখে, বাবার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে, সেই টাকায় আমাকে লণ্ডনে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছিল। আর আমি ভাবলাম, ভালই হল। বাবা তো আর আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবেন না। এইভাবে টাকাটা আদায় করে, দিব্যি প্লেনে চেপে লণ্ডনে বেড়িয়ে আসব। আমিও অমনি চান্দার কথায় মহেশানিদের ফ্ল্যাটে লুকিয়ে পড়লাম। কিন্তু লণ্ডন যেতে হলে পাসপোর্ট দরকার, আরও অনেক কিছুই দরকার। সে-সব আমার মাথায় আসেইনি। যখন এল, তখন আর আমার কিছু করার নেই। উল্টে চান্দা সিং আমাকে অনেকরকম ভয় দেখাতে লাগল। তখনই বুঝলাম, আমি কী সর্বনাশ করেছি। আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। এখন এদের হাত থেকে পালাতে পারলে রক্ষে। জীবনে আর এসব আমি কখনো করব না।"

গোগোল বলল, "জানো ডাবুদা, তোমার মা-দিদিরা কী রকম কাঁদছিলেন। এমন কী তোমার বাবাও—"

ডাবু বাধা দিয়ে বলল, "চুপ কর গোগোল, এখন আমাকে এসব কথা বলিস না। চান্দা সিং ঘুমোচ্ছে, জেগে গেলে উঠে আসবে এখানে। আমি চললাম। যা বললাম, তা মনে রাখিস।" বলেই সে চলে গেল।

গোগোল মাথা ঘুরিয়ে দেখল, ট্রাকের সামনে, বাঁ দিক দিয়ে, ডাবুদা পা নামিয়ে, দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। ট্রাক বেশ জোরেই চলছে। গোগোলের মনে হচ্ছে, আকাশ আর তারা-গুলো ওর সঙ্গে যেন ছুটে চলেছে। কিন্তু ডাবুদা যা বলে গেল, ও কি তা পারবে? বম্বে রোডে একটা আলোও ওর চোখে পড়ছে না। তার মানেই চারদিকে অন্ধকার। গোগোল ওর জীবনে কখনো রাত্রে এরকম অন্ধকারে রাস্তায় কোথাও বেরোয়নি। এখানকার রাস্তাঘাটের দুপাশে কী আছে, তা ও জানে না। শুয়ে-শুয়ে কিছু দেখতেও পাচ্ছে না। ওর মনে হল, সত্যি কি আলাদিনের প্রদীপ বলে কিছু আছে? থাকলে, এ সময়ে গোগোলের কাছে যদি থাকত, তবে ও নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড করে বসত। শুয়ে-শুয়ে ও কেবল দেখতে পাচ্ছে, উল্টো দিক থেকে এক-একটা গাড়ি ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর ওর গায়ে হঠাৎ আলোর ঝলক লেগে যাচ্ছে।

গোগোল হঠাৎ মাথার দিকে শব্দ শুনে চমকে উঠল। সামনের দিক থেকে কেউ আসছে। ডাবুদা? কিন্তু ডাবুদার তো এখন আসার কথা নয়? গোগোলের হাত-পা শক্ত হয়ে উঠল। অন্ধকারে হাত-পা-মুখের বাঁধন খোলা দেখা যাবে না। হাত দিলেই টের পাওয়া যাবে, সব বাঁধনগুলোই আলগা। ও চান্দা সিংয়ের গলা শুনতে পেল, "আরে ডাবু, তুমি আবার এলে কেন? আমি তো গোগোলকে খালি তেরপল চাপা দিয়ে দেব। যাতে সামনের চেকপোস্টে পুলিস বুঝতে না পারে, এখানে কিছু আছে।"

ডাবুদার গলা শোনা গেল, "কিন্তু তুমি ত্রিপল চাপা দিতে গিয়ে হয়তো গোগোলের দম বন্ধ করে দেবে।"

চান্দা সিংয়ের গলা শোনা গেল, "তুমি কি আমাকে এতটা বোকা ভেবেছ? আমি এমনভাবে তেরপল ঢাকা দেব, হাওয়া ঢোকবার অনেক ফাঁক থাকবে। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে যেন ওটা কোনরকমে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। চেকপোস্টের পুলিস যখন টর্চের আলো ফেলে দেখবে, কিছুই বুঝতে পারবে না। এই চেকপোস্টটা খুব কড়া। ড্রাইভারের লাইসেন্স দেখবে, কোথা থেকে কী মাল আনতে যাচ্ছে, তার পারমিট দেখবে, কিছু লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না তাও দেখবে। আর যদি পুলিসের সন্দেহ হয়, তা হলে আটকেও দিতে পারে। তখন যদি গোগোলের জ্ঞান ফিরে আসে, সব ফাঁস হয়ে যাবে।"

গোগোল বুঝতে পারল, চান্দা সিং ধুলোবালি মাখা একটা ত্রিপলের ভাজ খুলছে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে ডাবুদা। গোগোল

দেখল ওর পায়ের কাছেই চান্দা সিং দাঁড়িয়ে। গাড়িটা খুব জোরে চলেছে। চান্দা সিংকে একটা ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিতে পারলে, আর দেখতে হবে না। মরে না গেলেও একটা শত্রুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু গোগোলের সাহস হল না। যদি চান্দা সিং পড়ে না যায়? তা ছাড়া, ডাবুদা কিছু জানে না।

ডাবুদা হাত বাড়িয়ে বলল, "দাও, আমার দিকে একটা পাশ এগিয়ে দাও।"

গোগোল বুঝতে পারছে, ডাবুদা আসলে ভয় পাচ্ছে, চান্দা সিং বাঁধন খোলা পাছে টের পেয়ে যায়! চান্দা সিং ত্রিপলের একদিক ডাবুর দিকে বাড়িয়ে দিল। দুজনেই গোগোলের ওপর ত্রিপলটা আস্তে ফেলে দিল। ডাবুদা তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে বসে ত্রিপলের ভিতরে হাত দিয়ে ফাঁক করে দিল আর গোগোলের মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিল। ঘাড়ে আঙুল টিপল। গোগোল জানে, এখন আর চান্দা সিং ওকে দেখতে পাচ্ছে না। ও নিজের হাত তুলে ডাবুদার হাত ধরে বুঝিয়ে দিল, সব ঠিক আছে। যদিও ময়লা মোটা ত্রিপলের মধ্যে গোগোলের কষ্টই হচ্ছিল।

এই সময়ে সামনে খট্ করে একটা শব্দ হল, আর জৈল সিংয়ের বিরক্ত ঝাঁজালো গলা শোনা গেল, "আরে তুম দুনো উধার কী করছ? ইধার চেকপোস্ট আ গয়া।"

চান্দা সিং ডাবুদা দুজনেই সামনের দিকে এগিয়ে গেল। চান্দা সিংয়ের গলা শোনা গেল ...গছে।"

গোগোল আর কিছুই শুনতে পেল না। দু-এক মিনিট পরেই গাড়ির গতি ...ম এল। তারপর আস্তে-আস্তে একেবারে থেমে গেল। গোগোল বুটের খটখট শব্দ শুনতে পেল। লোক-জনের কথাবার্তার স্বরও কানে এল। একজনের গলা শোনা গেল, "মাল কিছু আছে?"

চান্দা সিংয়ের গলা শোনা গেল, "কিছু নেই স্যার, দেখে নিন।"

ট্রাকটা একবার দুলে উঠল। ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে দু একবার আলোর ঝিলিকও দেখা গেল। তারপরে আবার একজনের গলা শোনা গেল, "কলকাতা থেকে টাটা অবধি খালি গাড়ি যাচ্ছে? এরকম তো হয় না।"

চান্দা সিংয়ের গলা শোনা গেল, "কী করব স্যার, মালিকের যেমন হুকুম।"

গোগোলের বুকের মধ্যে ধকধক করছে, কলকল করে ঘামছে, আর ভাবছে, কী করবে? এখন ওর কী করা উচিত? গাড়ি একেবারে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। চেকপোস্ট মানে, পুলিসও রয়েছে। ও কি এখনই নেমে পড়ার সুযোগ নেবে কিন্তু এখানে নেমে পড়াটা কি ডাবুদা ঠিক বলবে?

গোগোল এইসব ভাবতে-ভাবতেই ট্রাকের এঞ্জিন গর্জে উঠল, গাড়ি আস্তে-আস্তে চলতে আরম্ভ করল। গোগোল আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারল না। হুড়মুড় করে ত্রিপলের ভিতর থেকে বেরিয়ে, ট্রাকের পিছন দিক ধরে ঝুলে পড়ল। লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমেই চিৎকার করে উঠল, "এই গাড়িটা আটকান, এটা ডাকাতের গাড়ি। এরা আমাকে আর ডাবুদাকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে।"

গোগোলের কথা শেষ হবার আগেই, ট্রাকটা যেন একটা লাফ দিয়ে গুলি-খাওয়া বাঘের মত ছুটল। আর চেকপোস্ট থেকে কয়েকটা টর্চের আলো একসঙ্গে গোগোলের ওপর এসে পড়ল। কয়েকজন ছুটে এল ওর দিকে।

(ক্রমশ)

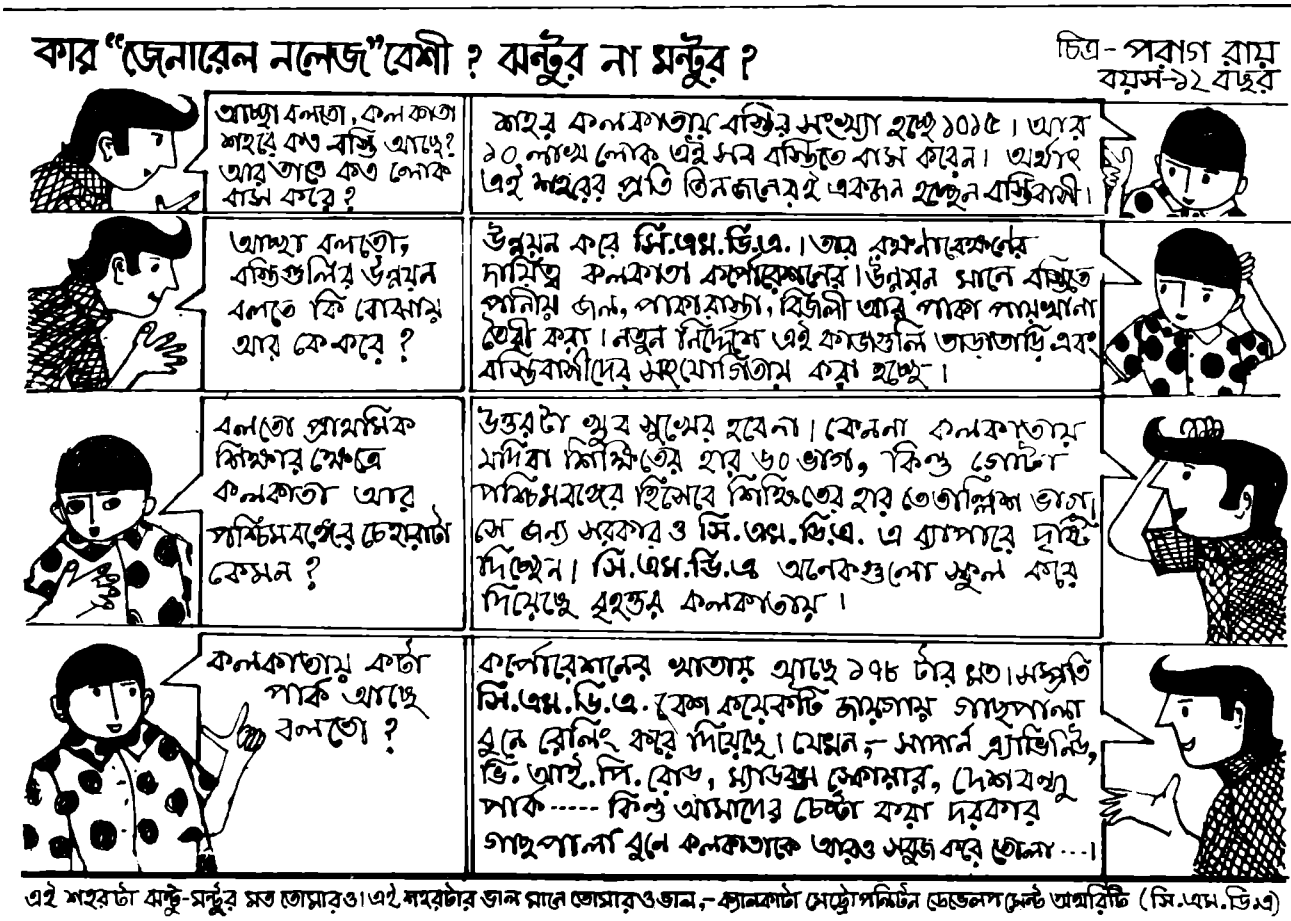

উপন্যাস

অলৌকিক

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে

বরদা একটা ভুতুড়ে ছবি দেখতে সিনেমায় গিয়েছিল। ছবি দেখতে বসে সে এক অদ্ভুত মানুষকে দেখল, যে খুশি-মতন মরে যায়, আবার বেঁচে ওঠে। ভয় পেয়েছিল বরদা খুবই। পরে লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল অবশ্য। ভদ্রলোকের নাম সিদ্ধেশ্বর। ওঁর কাজ হল মানুষ নিয়ে গবেষণা। সাধারণ মানুষ নয়, এমন সব মানুষ, যাদের মধ্যে অস্বাভাবিক অলৌকিক কোনো গুণ রয়েছে। দুমকার কাছে সেই গবেষণা-কেন্দ্র।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে নিয়ে এলেন দুমকার সেই রিসার্চ সেন্টারে। সেখানে মহাদেব বলে একটা লোক জুটেছিল, যার সঙ্গে বরদার চেহারায় খুব মিল। সিদ্ধেশ্বর মহাদেবকে বিশ্বাস করতেন না। মহাদেবকে তিনি শয়তান বলে মনে করতেন। মহাদেবের উদ্দেশ্য এই রিসার্চ সেন্টার থেকে দু-চার জনকে বাইরে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে টাকাপয়সা কামানো, মানুষকে ঠকানো। সিদ্ধেশ্বর মহাদেবকে জব্দ করতে চাইছিলেন। কিন্তু বরদাকে আনার পর নিজেই জব্দ হয়ে গেলেন। তাঁর প্রায় চোখের সামনেই এক টাঙাওয়ালা খুন হয়ে গেল। সিদ্ধেশ্বর সন্দেহ করলেন, সুজন বলে একটা লোক, যার গায়ে অসুরের মতন ক্ষমতা, সে মহাদেবের প্ররোচনায় খুন করেছে টাঙাওয়ালাকে। সন্দেহ করলেন বটে, কিন্তু সুজন কোথায়?

সুজনের খোঁজ চলতে লাগল। কিন্তু এরই মধ্যে মহাদেব এসে বরদাকে শাসিয়ে গেল। বলে গেল, দিন তিনেকের মধ্যে বরদা যদি কলকাতায় ফিরে না যায়, তবে তার অবস্থাও টাঙাঅলার মতন হতে পারে।

১১

ঘুম ভাঙতে বেলাই হয়ে গিয়েছিল বরদার। এখানে এসে পর্যন্ত সে ভোর বেলাতেই উঠে পড়ে, বেড়ায়-চেড়ায়, সকালের ঠাণ্ডা অথচ সতেজ হাওয়া খায়, আকাশ দেখে, রোদ ওঠা নজর করে, গাছপালা, পাখি—কত কী লক্ষ করে মুগ্ধ চোখে। তার ভাল লাগে। শরীর-মনও ঝরঝরে হয়ে ওঠে। আজ আর সকালে উঠতে পারল না বরদা বেলা হয়ে গেল, চোখ মেলে দেখল, রোদ আসছে জানলার ফাঁক ফোকর দিয়ে।

বাইরে এসে বরদা বুঝল, বেলা অনেকটাই হয়ে গেছে। রোদ আর ফিকে নেই। কাল সারা রাত বরদার ঘুম হয়নি। না হবার কারণ মহাদেব। মহাদেব তাকে শাসিয়ে যাবার জন্যে ততটা নয় যতটা অন্য কারণে। মানে, বরদা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, তার ঘরে ঢুকে সুটকেসের ডালা কে খুলেছিল? কেন খুলেছিল? এখানে চোর-টোর থাকার কথা নয়; বরদার ঘরেই বা কেন চুরি করতে আসবে? কী রয়েছে বরদার যে চুরি করবে?

সুটকেসটা বরদা ভাল করে দেখেছে। জামা, প্যান্ট, পাজামা গেঞ্জি—এইসব পোশাক-টোশাক ছাড়া তার সুটকেসে তেমন-কিছু ছিল না। টাকা-পয়সা বরদা সুটকেসে রাখেনি। কিছু তো চোখে পড়ল না বরদার যে বলবে, অমুক জিনিসটা আমার চুরি গিয়েছে! তা হলে চোর কেন এসেছিল? কোন মতলবে? চোর-ই বা কে?

এই বিচ্ছিরি চিন্তার সঙ্গে আরও একটা চিন্তা যেন লেজুড় হয়ে মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। সিদ্ধেশ্বর বলছিলেন, বেঁটে-বাঁটকুল চাঁদু অন্য মানুষের গলার স্বর নকল করতে পারে, চাঁদু সিদ্ধেশ্বরের গলা নকল করে রাত্তিরে যদি বরদাকে ডাকে—বরদা নিশ্চয় ঘুম ভেঙে উঠে দরজা খুলে দেবে, আর তখন চাঁদুর বদলে হয়ত দেখা যাবে সুজন দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা মহাদেব! কী করবে তখন বরদা?

ভয়, ভাবনা, দুশ্চিন্তা একবার চেপে বসলে আর কি যেতে চায়? বরদার মাথায় এই সব চেপে বসল। ঘুম আর কোথা থেকে আসবে? বরং সব সময়েই কেমন যেন ছমছমে হয়ে থাকল মনের ভেতরটা। কান পড়ে থাকল দরজায়।

একেবারে শেষ রাতে বরদা ঘুমিয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ আর জেগে থাকতে পারে মানুষ! ঘুমোবার আগে সে একটা মোটা-মুটি ধারণা খাড়া করে নিয়েছিল। ব্যাপারটা তার মাথায় এসেছে এবার। আসলে সিদ্ধেশ্বর আর মহাদেবের মাঝখানে সে হাজির হয়ে গেছে। ইচ্ছে করে নয়, নিজের মর্জিতেও নয়, সিদ্ধেশ্বরই বরদাকে হাজির করেছেন; আর মহাদেব সিদ্ধেশ্বরের মতলব ধরতে পেরে বরদার ওপরই বেশি খেপে উঠেছে।

আরও পরিষ্কার করে ব্যাপারটা ভাবলে বোঝা যায় যে সিদ্ধেশ্বর তাঁদের এই পি পি রিসার্চ সেন্টারে যাদের এনেছেন, যারা তাঁদের গবেষণার বিষয়—মহাদেব তাদের কয়েকজনকে ভাগিয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছে। মহাদেবের উদ্দেশ্য, বাইরে গিয়ে ভেলকি দেখানো, মানুষ ঠকানো এবং রাতারাতি টাকাপয়সা কামিয়ে বড়লোক হওয়া। মহাদেব চাইছে অর্থ আর প্রতিপত্তি। সিদ্ধেশ্বর চাইছেন মহাদেবকে তাড়াতে। একলা, মহাদেবকেই।

বরদা বুঝতে পারল না, মহাদেবকে যদি তাড়ানোই তাঁর ইচ্ছে, তবে সোজাসুজি তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন? এত ঘোরপ্যাঁচ কিসের? মহাদেবকে তাড়ানোর জন্যে বরদাকে কলকাতা থেকে ধরে আনার কারণ কী? সিদ্ধেশ্বরের সেই ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব রয়েছে যাতে তিনি সরাসরি মহাদেবকে ঘাড় ধরে এখান থেকে বার করে দিতে পারেন। তবু কেন দিচ্ছেন না? এর রহস্যটা কোথায়?

বরদা সিদ্ধেশ্বরের মতিগতি কিছুই বুঝতে পারছে না। বরং তার মনে হল, যে-কাজ সহজে করা যেত, সিদ্ধেশ্বর সেটা জটিল করে তুলছেন অকারণে, আর এই জন্যেই একটা অসহায় নিরীহ লোক মারা গেল।

হাত-মুখ ধুয়ে চা-জলখাবার খেয়ে বরদা সোজা সিদ্ধেশ্বরের অফিস-ঘরে গেল। অফিস-ঘর খোলা। কেউ নেই।

বরদা খোঁজ করতে গেল সিদ্ধেশ্বরের ঘরে। দরজায় তালা ঝুলছে।

এদিক-ওদিক দেখল বরদা, সিদ্ধেশ্বর নেই। কেউ জানে না, তিনি কোথায় গেছেন।

ওপর-ওপর দেখলে কিছুই বোঝা যায় না; যে যার মতন কাজকর্ম করছে, জল উঠছে কুয়ো থেকে, কাঠ চেরাই হচ্ছে, পেছনের সবজি-বাগানে কাজ করছে জনা দুই লোক, গাছের ছায়ায় বসে কেউ গল্প করছে, কেউ বা ঘরেই রয়েছে।

বরদা বুঝতে পারছিল না সিদ্ধেশ্বর কোথায় গেছেন! সুজনের খোঁজেই সাত সকালে বেরিয়ে পড়েছেন নাকি! হতে পারে। মানুষটি জেদী, কাল তিনি বিফল হয়েছেন, আজ হয়ত সফলও হতে পারেন।

এখানে-ওখানে উঁকি মেরে, খানিকটা পায়চারি করে বরদা নিজের ঘরেই ফিরে আসছিল, হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। দাঁড়াল বরদা, কান পাতল, মোটর বাইকের শব্দ। কোন দিক দিয়ে শব্দটা আসছে বোঝা যায় না।

গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বরদা।

সামান্য পরে ফটকের সামনেই মোটর বাইক দেখা গেল। সিদ্ধেশ্বর পেছনে বসে ছিলেন। সামনে নতুন মানুষ।

সিদ্ধেশ্বর নামলেন। ফটক খুলে দিলেন।

মোটর বাইক চালিয়ে যে-লোকটি ভেতরে ঢুকলেন, বরদা তাঁকে লক্ষ করতে লাগল। বয়েস বেশি নয়; তবু বরদার চেয়ে বড়। ছিপছিপে চেহারা, গায়ের রঙ ময়লা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, চোখে চশমা।

সিদ্ধেশ্বর ফটক বন্ধ করে হেঁটে-হেঁটেই আসছিলেন। মোটর বাইক সোজা খড়ের ঘরের দিকে চলে গেল এঁকে বেঁকে।

বরদা কয়েক পা এগিয়ে গেল সিদ্ধেশ্বরের দিকে।

"কোথায় গিয়েছিলেন? সকাল থেকেই বেপাত্তা!" বরদা সামান্য চেঁচিয়ে বলল।

সিদ্ধেশ্বর অল্প দূরেই ছিলেন, এগিয়ে আসছিলেন। বললেন, "কাছেই ছিলাম।"

বরদা একটু অপেক্ষা করল। সিদ্ধেশ্বর সামনে এলেন।

"সুজনের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর।

"কোনো খবর পেলেন?"

সিদ্ধেশ্বর ইশারায় ডাকলেন বরদাকে। ডেকে হাঁটতে লাগলেন। বললেন, "সুজন এখানেই আছে।"

"এখানে?" বরদা অবাক হয়ে তাকাল। "কোথায়?"

"ধারেকাছে।"

বুঝতে পারল না বরদা। সুজন যে কাছাকাছি কোথাও রয়েছে, এ তো অগেও শুনেছে। কিন্তু কোথায়?

"ধারেকাছে মানে কোথায়?" বরদা কৌতূহল বোধ করছিল।

সিদ্ধেশ্বর কিছু বললেন না, হাঁটতে লাগলেন।

হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধেশ্বর অন্য কথা পাড়লেন। "সতীশকে দেখলেন?"

"সতীশ! মানে ডাক্তার?"

"হ্যাঁ।"

বরদারও সেই রকম মনে হয়েছিল একবার। গতকাল সতীশ ডাক্তারের আসার কথা ছিল, আসতে পারেননি; আজ আসার কথা। অবশ্য বরদা ভাবেনি যে, মোটর বাইক চেপে ডাক্তার আসবে।

"উনি কোত্থেকে আসেন?"

"আসে অনেক দূর থেকে। আগে ট্রেনে এসে বাস আর টাঙ্গা করে আসত। আজকাল একটা মোটর বাইক কিনেছে সেকেন্ড হ্যান্ড। ওতে চেপেই আসে। ভোর-ভোর বেরোয়, ঘন্টা আড়াইয়ের মধ্যে পৌঁছে যায়। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আজ ও থাকবে। কাল সকালে আবার চলে যাবে।"

বরদা বলল, "আপনি কি ওঁকে রাস্তায় দেখলেন?"

"হ্যাঁ।"

নিজের ঘরের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বর। পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খুললেন।

বরদা বললেন, "কাল একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে।"

দরজা হাট করে খুলে ভেতরে ঢুকলেন সিদ্ধেশ্বর। জানলা খুলে রেখে গিয়েছিলেন আগেই। "বসুন... কী ঘটনা ঘটল আবার?"

বরদা কালকের ঘটনার কথা বলল। কে যেন তার ঘরে গিয়ে সুটকেস খুলছিল। অথচ কিছু নেয়নি, কিছুই চুরি যায়নি।

সিদ্ধেশ্বর রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। বরদা যখন তাঁর ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিল কাল রাত্রে, তখন কে তার ঘরে গিয়ে তালা খুলল, সুটকেস হাতড়াল? এমন দুঃসাহস কার হবে?

সিদ্ধেশ্বর চিন্তিতভাবেই বললেন, "আপনি ভুল করছেন না তো?"

"না।"

"আশ্চর্য...সুটকেস ভাল করে দেখেছেন

"দেখেছি।"

"কিছু খোয়া যায়নি?"

মাথা নাড়ল বরদা।

সিদ্ধেশ্বর কিছু যেন ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতেই বললেন, "আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।"

চলে গেলেন সিদ্ধেশ্বর। বরদা বসেই থাকল। বসে বসে সিদ্ধেশ্বরের ঘর দেখতে লাগল। জানলা খোলা, রোদ এসে পড়েছে ঘরে। সাদামাটা অথচ গোছানো ঘর। পুব দিকে একটা পুরনো ধরনের টেবিল। কাগজপত্র, দু-একটা বই, পত্রিকা পড়ে আছে। ফাউন্টেন পেনের কালি। কাচের চৌকোনা পেপার-ওয়েট। পরিষ্কার বিছানা। একটা মাত্র আলমারি একদিকে। দেওয়ালে দু চারটে ফোটো টাঙানো।

ফিরে এলেন সিদ্ধেশ্বর। বোধহয় চোখে-মুখে জল দিয়ে এসেছেন। ভেজা-ভেজা দেখাচ্ছিল।

বিছানার একপাশে বসলেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আপনি বোধহয় ভাল করে সুটকেস দেখেননি?"

"কেন?"

"একেবারে অকারণে কেউ সুটকেস খুলতে পারে না।"

"কিন্তু আমি দেখেছি।"

"নজর করেননি, বা খেয়াল করেননি," সিদ্ধেশ্বর বললেন, "ছোটখাট জিনিস আপনার নজর এড়িয়ে গেছে।"

"সুটকেসে আমার জামাকাপড় ছাড়া এক-আধটা বই ছিল। আপনি নিজেই দেখেছেন হাওড়া স্টেশন থেকে আমি কিনেছিলাম সময় কাটানোর জন্যে। একটা বই পড়ছি, বাকি দুটো সুটকেসে ছিল। এ ছাড়া আর তো কিছু ছিল না। একটা ছোট নোটবইয়ের মতন ছিল। তাতে নিজের নাম-ঠিকানা ছাড়া সামান্য কিছু এন্ট্রি ছিল। ওটা কোনো কাজের জিনিস নয়।"

সিদ্ধেশ্বর বরদার চোখে চোখে তাকিয়ে বললেন, "নোটবইটা আছে?"

বরদা এই আচমকা প্রশ্নে কেমন থতমত খেয়ে গেল। একবার মনে হল, দেখেছে; আবার মনে হল, দেখেনি। ঠিকমতন খেয়াল করতে পারল না বরদা। দমে গিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে, দেখেছি।"

(ক্রমশ)

ছবি মদন সরকার

খেলা দারুন জমে উঠেছে! পশ্চিম জার্মানি বনাম হল্যান্ড।

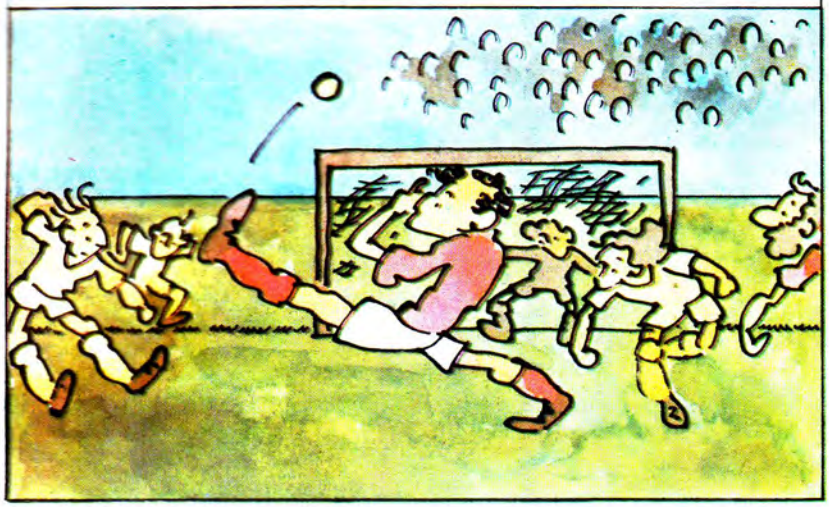

একটি খেলোয়াড় দুর্ধর্ষ খেলছে! তারজন্যেই পশ্চিম জার্মানি এক গোল-এ এগিয়ে গেল !

এমন খেলা বিশ্বের দর্শক আগে কখনও দেখেছে ?

বিশ্বকাপ এল জার্মানির সেই খেলোয়াড়ের হাতে

লোকে বলে, আমাদেরই নোলেদা সেদিন ব্লেকেনবাউয়ার-এর ছদ্মবেশে খেলেছিল !

আঁকো

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

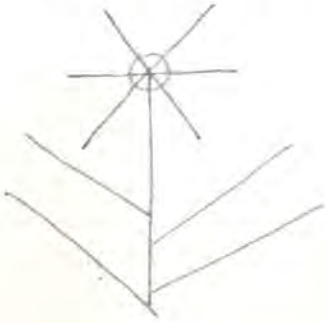

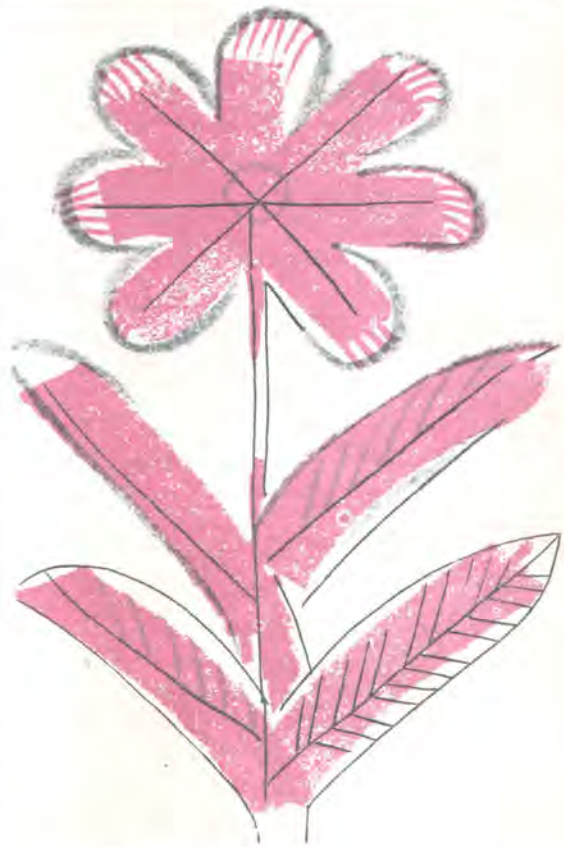

রঙিন প্যাস্টেল দিয়ে আঁকা শুরু হয়েছে আগেই। এবার নমুনায় দ্যাখো কেমন ভাবে ছবির কথা ভাববে।

একটা ফুল আঁকতে গেলে প্রথমে লাইন দিয়ে একটা ছক করে নেবে, তারপর আড়াআড়ি ভাবে সেই ছকের লাইনকে মাঝখানে রেখে প্রয়োজন-মতো রঙিন প্যাস্টেল দিয়ে টেনে নাও। গোটা প্যাস্টেল দিয়ে সম্ভব না হলে দরকার-মাফিক টুকরো করে নিও। আড়াআড়ি ভাবে প্যাস্টেলের কাজ শেষ হলে তোমার ইচ্ছেমত সরু মোটা লাইন দিয়ে ছবি শেষ করো।

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

সারা পশ্চিমবাংলায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি মণিমেলা পতাকা-দিবস হিসাবে পালিত হয়েছে। ওইদিন মণিমেলার ভাই বোন ও স্বেচ্ছাসেবী শিশুকল্যাণ-কর্মীরা পথে-ঘাটে, অফিসে-আদালতে, স্কুলে-কলেজে মণিমেলার শিশুকল্যাণ-তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। এই সংগ্রহের মোট পরিমাণ ১২,৭০৮ টাকা ২৪ পয়সা। সকল শ্রেণীর মানুষ মণিমেলার শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের সহায়তায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্থ সাহায্য করায় কেন্দ্র-পতি শ্রীঅশোককুমার সরকার সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মণিমেলা বার্ষিক শিক্ষণ-শিবিরে গৃহীত কর্মীদের সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। মণি-মেলার শিশুকল্যাণ কার্যক্রম অনুসারে শিক্ষিত এক স্বেচ্ছাসেবী কর্মিদল গড়ে তোলার জন্য শিক্ষণ-শিবিরে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৭-৭৮ সালে গৃহীত প্রাথমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ৩৪ জনের মধ্যে ২৯ জন (৮৫.৩%) উত্তীর্ণ হয়েছে। মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ১৪ জন এবং চূড়ান্ত—১ সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ১৩ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই উত্তীর্ণ বলে গণ্য হয়েছে। পরীক্ষাগুলিতে যথাক্রমে শ্রীমতী সুস্মিতা ধর (আনন্দ মণিমেলা, বার্নপুর), শ্রীমতী রুমা নাথ (কসবা মণিমেলা, কলকাতা) এবং শ্রীতরুণ চক্রবর্তী (বাণীতীর্থ মণিমেলা, বেলুড়) প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

গত ১ বৈশাখ মণিমেলা মহাকেন্দ্রের নিয়মিত শাখা কেন্দ্র-গুলি প্রভাতফেরি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শারীর ক্রীড়া প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন বছরকে সাদরে বরণ করে নেয়।

মণিসন্দেশ

শ্রীরামপুরের শান্তিকামী মণিমেলার ৩০তম প্রতিষ্ঠা উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। বেলুড়ের বাণীতীর্থ মণিমেলার ১৩শ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মণি-ভাইবোনেরা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করে। গড়িফার প্রগতি মণিমেলার বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নবদ্বীপের বিদ্যার্থী মণিমেলার ১৭শ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। দমদমের মৌসুমী মণিমেলার ৫ম বার্ষিক উৎসব নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল। বেহালার বৈশাখী মণিমেলার প্রথম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে।

বরাহনগরের রবীন্দ্রপল্লী মণিমেলা সম্প্রতি নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়াম আয়োজিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক মডেল প্রদর্শন করে প্রশংসা পেয়েছে। কলকাতার যাদবপুর কলোনি মণিমেলা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। হাওড়ার স্বামীজী মণিমেলা স্থানীয় শিশুদের জন্য এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। নবদ্বীপের বিদ্যার্থী মণিমেলা হিমালয়ান ট্রেকিং দলের নেতা শ্রীরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছে।

শ্যামনগরের আতপুর বৈশাখী মণিমেলা পুরী, ভুবনেশ্বর ইত্যাদি স্থানে এক শিক্ষা-ভ্রমণে গিয়েছিল। এই মণিমেলার আর একটি দল সম্প্রতি দিঘা বেড়িয়ে এল। কসবার বোসপুকুর ধর্মতলা মণিমেলার ৫ম বার্ষিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। নৈহাটির গড়িফা মণিমেলার ৫ম বার্ষিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়েছে। নিমতার নারায়ণপল্লী মণিমেলার ৫ম বার্ষিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী ও বনভোজন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাওড়ার স্বামীজী মণিমেলার ২২তম ক্রীড়া ও শিল্প প্রদর্শনী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। শ্যামনগরের পিরতলা সারথি মণিমেলা বাসুদেব-পুর গ্রামে এক বনভোজন ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

অখিল ভারতীয়
ক্যামেল
কালার কনটেস্টে যোগ দাও

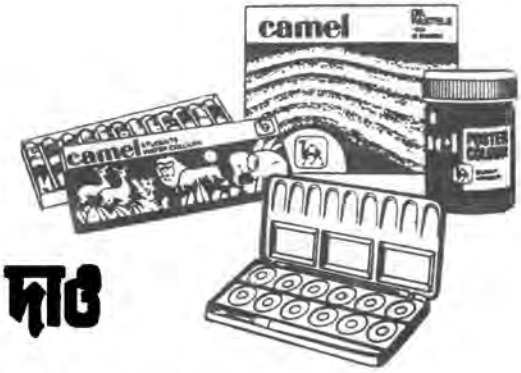

আমাদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় ২০০০ স্কুলের ১৪ লাখ ছাত্রছাত্রী সাড়া দিয়ে আরও বড় প্রতিযোগিতা ডাকতে বাধ্য করেছে।

তোমাদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিভাকে ক্যামলিন সমাদর করে। ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গার যে কোনো স্কুলেরই তুমি অঙ্গীভূত হওনা কেন ক্যামলিন হাতঘড়ি, এলার্ম ঘড়ি এরকম সব সুন্দর উপহার নিয়ে পৌঁছে যাবে তোমাদের কাছে। আমাদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় যোগ দাও তোমার মনের মত করে আঁকো আর আমাদের দেওয়া ৭০০ প্রাইজের যে কোনো একটা নিয়ে যাও।

বিষয় হিসেবে আঁকার জন্য আমরা তোমাদের ছ'টা প্রিয় বস্তু দেবো — খেলাধূলো, উৎসব, পাখী, প্রজাপতি, ফুল ও জন্তুজানোয়ার। তোমরা কেউ-ই খুব ছোট বা খুব বড় নও প্রাইজ জিতে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে — কারণ আমরা শ্রেণীমান অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করেছি।

(ক) প্রি—প্রাইমারী থেকে স্ট্যাণ্ডার্ড IV
(খ) স্ট্যাণ্ডার্ড V থেকে স্ট্যাণ্ডার্ড VIII
(গ) স্ট্যাণ্ডার্ড IX থেকে স্ট্যাণ্ডার্ড XI

কোনোরকম প্রবেশমূল্য নেই এই প্রতিযোগিতার জন্য। তোমাদের শুধু দরকার প্রবেশপত্র নিয়মাবলীসহ যা পাওয়া যাবে স্টুডেন্ট ও আর্টিস্ট জলরং কেক, স্টুডেন্ট জলরং টিউব, পোস্টার কালার ট্রায়াল প্যাক এবং অয়েল প্যাস্টেলের সংগে।

ক্যামলিন প্রাঃ লিঃ
আর্ট মেটিরিয়াল ডিভিসন,
আন্ধেরী, বোম্বাই-৪০০ ০৫৯

তোমার ক্যামেল রং আজই কেনো
প্রতিযোগিতার সময় ব্যাপ্তি—
জুন—সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

VISION 784 BEN

ANANDAMELA Regd. No. WB CC 264

আনন্দমেলা । জুন ১৯৭৮ । দেড় টাকা